পশুপাখীর আচার ব্যবহার

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

পশুপাখীর আচার ব্যবহার

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PASU PAKHIR ACHAR BYABOHAR
Jyotirmoya Chattopadhyaya

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ১৯৮২

প্রকাশক ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রক ঃ
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
টাইপোগ্রাফার্স অফ ইণ্ডিয়া
৩৬এ, কে. জি. বোস সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

[ঘোষণা ঃ সরকার কর্তৃক বরাদ্দীকৃত নির্দ্ধারিত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

Published by Prof. Dibyendu Hota Chief Executive Officer West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

মূলতঃ আমি জীববিজ্ঞানের লোক। তাই জীবনকে জানার আগ্রহ আমার ছেলেবেলা থেকে। মানবজীবনে সুস্থতা রক্ষার যে বিজ্ঞান, তাই একদিন আমার একমাত্র উপজীবিকা হয়ে উঠল। কিন্তু তবু কি জীবন-রহস্যের প্রতি অনুরাগ একটুও কমল ?

তাই পেশাটুকু বাদ দিয়ে, যা কিছু করবার চেষ্টা করেছি, সব সেই জীবনের অনুরাগে। কবিতা বা গান, কি সাহিত্য, মেলামেশা, সব জীবনকে ভালবাসায়। কখনো তা প্রসারিত হয়েছে, জাপানী ফুল বিন্যাসকলা—ইকিবানায়; কখনো ওদের বালখিল্য বৃক্ষসৃজনী—বনসাইয়ে। সব কিছুই চর্চা করেছি সেই অনুরাগে।

আকাশে একঝাঁক পোষা পায়রা যখন উড়ছে, হঠাৎ দূর থেকে একটা বাজপাখী তেড়ে এলো দেখে, ডানা বন্ধ করে, টুপ টুপ করে নিজেদের ছাদে নেমে আসা লক্ষ্য করেছি। তা একটি নোট বইয়ে লিপিবন্ধও করে রেখেছি। ঠিক ওমনি ভাবেই দেখেছি আর লিখে রেখেছি, একটি সদ্যজাত বেরালছানা, দুটো কুকুরের মুখের কাছে এসেছে। তবু কুকুরগুলো ওকে কিছু বলেনি।

একদিকে আমার এই সামান্য "ন্যাতা কাঁথা।" আর একদিকে জগৎ-বিখ্যাত বিজ্ঞানী কনরাড লরেন্স, উইলি ফ্রিৎস, নিকো টিনবারজেন কি ডেসমন্ড মরিস বা জয় এ্যাডামসনের বই। এই বইগুলি পড়লে দেখা যায়, প্রাণীকুলের আচরণতত্ত্ব, আজ একটি স্বনির্ভর বিজ্ঞান। আর এ বিষয়ে বই লেখা হয়েছে শ'য়ে শ'য়ে। সেখানে আমার অভিজ্ঞতাটুকুর কি বা মূল্য। তবু আবার মনে হল বাংলায় এ বিষয়ে বই কই ? সুরু করলাম পড়াশোনা। ফলে এই বই।

ইতি
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

মহালয়া, ১৩৮৯
৮৪, রসা রোড
ইষ্ট সেকেন্ড লেন
কলিকাতা—৭০০০৩৩

পরম স্নেহভাজন

শ্রী সলিল কুমার মুখোপাধ্যায়কে

সূচীপত্র

পশুপাখীর আচার ব্যবহার

১

বেরাল-মায়ের মহাযুদ্ধ

চোখ মেললে দেখি প্রাণের প্রাচুর্য; রঙে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে। কোথা থেকে এল এত প্রাণ? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত গল্প কি আর কম খাড়া করা হয়েছে? কিন্তু আমার গল্প অন্য।

আমাদের দেশের হিতোপদেশ, কি গ্রীস দেশের ঈশপের গল্পগুলি রকমারি প্রাণী নিয়ে। মনে হয়, এই প্রাণীগুলির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মনের চরিত্রই যেন দেখা যাচ্ছে। তবু এই প্রাণীগুলিও তাদের নিজস্ব প্রাণিচরিত্র নিয়ে আমাদের কাছে জীবন্ত। এমন কি বলতে পারি এই গল্পগুলির মডেলেই শেয়াল আমাদের কাছে চালাক, সিংহ মহৎ, কি সাপ হিংসুক প্রকৃতির।

আজকের প্রাণিবিজ্ঞান এক অসাধারণ উঁচু স্তরে পৌঁছেছে। আর পৌঁছেও স্থির হয়ে বসে নেই। সে বিজ্ঞানের চূড়া যেমন প্রতিনিয়ত আরো উঁচু হচ্ছে, তার ক্ষেত্রের আয়তনও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। একটু আধটু হলেও, নেহাৎ বাড়ীর কুকুরটার কথা বলতে গেলে পর্যন্ত, তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। বিজ্ঞানের এ প্রভাবটা শুভ।

শিশুদেরও যেমন হয়, অতীতের মানুষদেরও তেমনি, প্রাণীর চেহারা; অর্থাৎ যাকে বলতে পারি তার শরীর গঠনের দিকেই জীববিজ্ঞানের নজরটা পড়েছিল। কিন্তু আজ চালচলনও জীববিজ্ঞানেরই একটি শাখা হিসাবে সুরু করে, একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে। এ বিজ্ঞানের নাম দেয়া হয়েছে **Ethology**—ইথোলজি, বা চরিত্রবিজ্ঞান কি আচরণ-বিজ্ঞান।

বাড়ীতে যদি কারুর দুটি বেড়াল থাকে, যেমন দুজন মানুষের চরিত্র; আচারব্যবহার আলাদা হয়, ওদেরও তাই দেখি। তাই তারাও গল্পের এক একটি চরিত্র হয়ে গল্প জমিয়ে দিতে পারে।

নামটা ছিল ছেলেটার একটু অদ্ভুত, কই-ভোলা। নামটা কোন পরিচিত নামের ধারে কাছে নয় বলেই এত মনে আছে; আর ছেলেটাকেও। ছেলেটার বয়স বোধ হয় তখন হবে, বছর বারো। কামারহাটিতে আমার ছোড়দির বাড়ী ছেলেটা থাকত; কাজকর্মও করত।

স্বামী-স্ত্রী, দুজনের সংসার। সেদিন সকালে ওরা চা খেতে বসেছে নিচে খাবার ঘরে। ওপরে ওদের শোবার ঘর, অন্য ঘরটা, ঘরের কোলের বারান্দা, ঘরের পাশের ছাদ, সব একেবারে ফাঁকা।

হঠাৎ কই-ভোলা, খুব উত্তেজিত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। এসে বললে, "মা মা, ওপরে খুব যুদ্ধ হচ্ছে।"

"যুদ্ধ আবার কিসের রে ?"

"হাঁ মা, ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে।"

তারপর যুদ্ধ, যুদ্ধের পরিণতি, সবটাই সংক্ষেপে বলি।

বাড়িতে একটা পোষা বেড়াল ছিল। তার নাম মিনি। দিন কয়েক আগে মিনির তিনটে বাচ্চা হয়েছিল। শোবার ঘরের পাশের ঘরটাও বেশ বড়। একটা বড় খাট, বেশ কিছু বিছানা, টেবিল, চেয়ার, এটা ওটা নানান জিনিস-পত্রে ভর্ত্তি ছিল ঘরটা।

প্রজাতিকে বাঁচানোটা প্রাণী মাত্রেরই একটা সংস্কার। মাদি বেড়ালকে বাচ্চা হলেই তাই খুব সাবধানে থাকতে হয়, যাতে বাচ্চাগুলোর কোন ক্ষতি না হয়। আবার এদের বাচ্চারাও জন্মায় খুব অসহায় অবস্থায়। যখন জন্মায়, তখনও এদের চোখ ফোটে না, না থাকে গায়ে লোম। লোম ছাড়া লাল চামড়া এত নরম, যে সামান্য আঘাত লাগলে, কি নরম জায়গায় না শোয়ালে জখম হতে পারে। তাই নরম হবে, অথচ বাচ্ছাগুলোর ঠান্ডা লাগবে না, তার ওপরে জায়গাটা খুব লুকোনো জায়গা হবে, এমনি হওয়া চাই, যাতে কারুর নজরে না পড়ে।

অন্য সবার নজর বাঁচানো তো বটেই, এমন কি এইগুলি যার বাচ্চা সেই মদ্দা (হুলো) বেড়ালের হাত থেকেও বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে হবে। তাই মাদি (মিনি) বেড়ালটাকে বাচ্চাগুলোকে বার বার বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়। এ ব্যাপারটা সকলেরই এত জানা যে প্রায় প্রবাদের মতন একটা কথাই দাঁড়িয়ে গেছে, কথাটা, "বেরাল নাড়ানাড়ি"।

শোবার ঘরের পাশের ঘরটা, যে কোন মিনি বেড়ালের বাচ্চাদের আঁতুড় ঘর হিসেবে আদর্শ। এখানে নরম ও উত্তাপ সংরক্ষক জিনিস রয়েছে প্রচুর। ঘরটা পড়ে থাকে, বিশেষ কেউ ঢোকে না। একই ঘরে কিছু জিনিসপত্র থাকায়,

তথাকথিত বেরাল নাড়ানাড়ি করে বাচ্চাগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় লুকোবার পক্ষেও ঘরটা ছিল আদর্শ।

কয়েকদিন আগে মিনির তিনটে বাচ্চা হয়েছিল। বাচ্চা যে তিনটে হয়েছিল এটাও বুঝতে পারা গেল এতদিনে, যখন তাদের চোখ ফুটেছে, লোম গজিয়েছে, তারা নিজেরাই এ-ঘর ও-ঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর, একবার ঘোরাঘুরি সুরু করলে তখন তাদের পায় কে ? এত দিন তাদের মা, বাচ্চাদের পায়খানা, প্রস্রাবের পর্যন্ত কোন চিহ্ন রাখে নি, পাছে তাইতে ওদের কেউ হদিশ পেয়ে ক্ষতি করে। কিন্তু এখন নিজেদের চোখ ফোটার পর, ওরা কখনো যাচ্ছে ছাদে, কখনো বারান্দায়।

আর এইটিই হল কাল। যে জন্য এই "যুদ্ধ"।

এমন নধর, কচি-কচি তিনটি বেড়ালছানা দেখে, একটা শকুনির লোভ হল। সে ভাবলে চিরকাল কি শুধু মরা জন্তুদের পচা মাংস ভাগাড়ে গিয়েই খেতে হবে ?

বোধ হয় এরই ব্যতিক্রম করতে গিয়ে শকুনিটা একটা বেড়ালছানাকে ধরতে গিয়েছিল। ব্যস আর যাবে কোথা ? ওদের মা মিনি ছিল কাছে। মার সামনে বাচ্চাদের উপর আক্রমণের উপক্রম ?

বোতল ধোবার বুরুশ যে রকম হয়, তেমনি মিনির শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। কোমরটাকে পর্যন্ত কুঁজো করে, অনেকটা উঁচু হয়ে মিনি, যত বড় সে, হয়ে উঠল দেখতে তার ডবল। তা ছাড়া পায়ের আঙ্গুলের বাঁকানো নখগুলো পর্যন্ত বার হয়ে এসেছে। তা যদি গায়ে লাগে, তবে ভিতরের মাংস শুদ্ধ ছিঁড়ে নেবে। দাঁত গুলিও বার করা। চোখের তারাগুলো বড় বড়। বেড়ালের মুখ থেকে যে রকম আওয়াজ বার হয়, তা থেকে ভিন্ন ও অনেক জোরালো শব্দ মুখে।

শারীর বৃত্তির দিক থেকে, কোন প্রাণীর রাগ হলে, কয়েকটি হর্মোন, যেমন এ্যাড্রিন্যালিন আর কয়েকটি এনজাইম, যেমন কোলিন-এসট্যারেজ, ইত্যাদির সাহায্যে সে প্রাণীর এ রকম চেহারা হয়। কনরাড লরেন্স এর নাম দিয়েছেন, ডিসপ্লে (**display**), দেখানো।

কনরাড লরেন্সের অভিমত হল, যুদ্ধ, বিগ্রহ, হত্যা, এ সব যতদূর সম্ভব বন্ধ করার জন্যই প্রকৃতি প্রাণীকে ডিসপ্লে রিএ্যাকশান দিয়েছে। কারণ এতে শত্রু ভয় পাবে ও পালিয়ে যাবে, এ সম্ভাবনা রয়েছে। ডিসপ্লের

পরে আবার, যে প্রাণী রাগ দেখাল, তার রাগও পড়ে যাবে ও তার ফলে দুটি প্রাণীর মধ্যে সংঘর্ষটা হয়ত বেঁচে যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম।

এ ক্ষেত্রে মিনির মাতৃস্নেহের উপর আঘাত হেনে, শকুনিটা তার বাচ্চাদের ক্ষতি করতে চাইছিল। তাই এর আর কোন ক্ষমা নেই। মিনি তার নখ, দাঁত, এগুলির সাহায্যে, একটা বেড়ালের চেয়ে শারীরিক আয়তনে অনেক বড় একটা শকুনিকে আক্রমণ করলে। শকুনিটাও তার ঠোঁট, পায়ের নখ ও ডানার ঝাপটায় মিনিকে আঘাত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

এর ভিতরে মিনির বাচ্চা তিনটে ওখান থেকে পালিয়েছে তাদের ঘরে, একেবারে গায়ে আঁচড়টি না লেগে, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে। কিন্তু তাতেও মিনি যুদ্ধ থামাতে রাজী নয়। ওর বাচ্চাদের পক্ষে ভবিষ্যতে যার দ্বারা বিপদ আসতে পারে, তাকে ও ছেড়ে দেবে না।

এই ব্যাপারটাকেই কই-ভোলা বলেছিল যুদ্ধ। সত্যি তার কমে কিছু বলাই হয় না। ক্ষত বিক্ষত হয়ে উড়ে পালাবার, যত চেষ্টাই করতে থাকে শকুনিটা, মিনি তাকে আরো আঁচড়ায়, কামড়ায়, মারে। তার ফলে ছাদটা, এমনকি বারান্দাটা রক্তারক্তি। ছাদ থেকে উড়ে পালাতে না পেরে, শকুনিটা বারান্দা দিয়েই পালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিনি তাকে মেরে ফেললে। তার মৃতদেহটা পড়ে রইল, শোবার ঘরের সামনের বারান্দায়।

মিনির এই এপিক রোষ ঠান্ডা হতে অনেকটা সময় লাগল। তার তিনটে বাচ্চাকে সুস্থ, হাসিখুসী দেখে তবে সে রাগ তার কমে।

২

বেড়ালের পালানো আঁতুড়ঘর

যখন বাচ্চা হবার সময়টা কাছে আসে তখন সে বেরালই হক বা অন্য প্রাণীই হক, হবু মার মেজাজটাই যেন বদলে যায়। যে বেরালটা হয়ত ছিল খুবই সামাজিক, (মানুষের সমাজে সামাজিক আর কি) অর্থাৎ কিনা বাড়ীর লোকের সঙ্গে সঙ্গে যে সর্বদা ঘুরে ঘুরে বেড়াত, গায়ে গা ঘসত, যাকে ভালবাসে তার বিছানায় গা ঘেঁসে শুয়ে থাকত, দেখা যায় তারই ধরনধারণটা যেন বদলে গেছে।

মেজাজের এই বদলটাও হয় হঠাৎ। হঠাৎ একদিন দেখা যায়, কই বেরাল-টাতো আর কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে না, কি বিছানায় এসে শুলো নাতো কই ! আসলে সে তখন তার হবু বাচ্চাদের জন্য, সবার চোখের আড়ালে যা, এইরকম একটা আঁতুড়ঘর খুঁজছে। এমনই অসহায় অবস্থায় বাচ্চারা জন্মায়, যে তাদের লুকিয়ে না রাখলে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানো অসম্ভব। তার শত্রু কি আর একটা ? সবাই শত্রু। এমনকি এ হবু বাচ্চাদের বাপ সে শুদ্ধ শত্রু।

এখানে একটা খটকা লাগে। প্রকৃতির যে ব্যালেন্স বা শৃঙ্খলা, তারই খাতিরে তো প্রজাতিকে বাঁচানো দরকার। তবে তার জ্ঞাতি শত্রু হলে চলবে কি করে। অন্য প্রাণীর শত্রুতা না হয় স্বাভাবিক। কিন্তু বাচ্চাদের বাপ ? এখানেও প্রকৃতির একটা কল্যাণকর ভূমিকা। বাচ্চার পুষ্টির জন্য ও তার ব্যক্তিত্ব (প্রাণিত্ব ?) জন্মের পরে যাতে ঠিক ভাবে বেড়ে ওঠে, তার জন্য চাই মার সঙ্গে একান্ত যোগাযোগ। তাদের দুধ খাওয়ানো থেকে, নাড়াচাড়া করা, শরীর গরম রাখা, সবই যাতে মাকে বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হয়, তাই হয়ত প্রকৃতির ঐ নিয়ম। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে আবার ঐ অভ্যাসের কমবেশী আছে। তা তো থাকবেই। প্রকৃতির পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টগুলো তো আর শেষ হয়ে যায় নি। এই ভাবে প্রকৃতি তা চালাচ্ছে।

বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে বলেই, কামারহাটির ওই রাস্তাটায় লরিওয়ালারা সার সার লরি দাঁড় করিয়ে রাখত; হক না তাতে এখানকার

লোকজনদের অসুবিধা। লরিগুলো যে কতরকমের মাল, কত জায়গায় নিয়ে যেত, তার কি আর শেষ আছে ? এমনি একটা লরি ছিল খড়ের লরি। কি হয়ত এমনও হতে পারে, অন্য জিনিসপত্রের প্যাকিং হিসাবে খড়কুটো, এইসব বার বার ব্যবহার করা হচ্ছিল সেইজন্য লরিটার মেঝের উপরে প্রচুর খড়কুটো পড়েছিল।

এ লরিটা আবার খারাপও হয়েছিল। একটু বেশীরকমেরই খারাপ হয়েছিল, আর কি। সেইজন্য লরিটা দিনের পর দিন, কি মাসাবধি পড়েই রইল। পড়ে থাকতে থাকতে বাড়ী যেমন প'ড়োবাড়ী হয়ে যায়, লরিটাও যেন তেমনি প'ড়ো লরি হয়ে উঠল। স্থানীয় অধিবাসীদের তাতে মনে হতে লাগল, যে প'ড়ো লরি এক আপদ জুটল তো। আর সেরে সুরে এ লরি যদি আবার চলে না যায়, তা হলে তো যতদিন এর কাঠ লোহাগুলো বিক্রি না হয়ে যাচ্ছে, ততদিন এটা পাড়ার একটা বিষফোঁড়ার মত থাকবে পড়ে।

কিন্তু কারো সর্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস। কামারহাটিতে আমার ছোড়দির বাড়ীর মাদি বেরাল মিনির পক্ষে ওই লরিটা হল সেই পৌষ মাস। ওর বাচ্চা হত খুব ঘন ঘন। আর প্রতিবার বাচ্চা হবার সময়, খুব লুকানো একটা জায়গা ওকে খুঁজে বার করতে হত। সেখানে বাচ্চাদের গরম রাখবার জন্য তুলো কি কাপড় বা খড়, এ ধরনের কিছু থাকা চাই। বাড়ী থেকে খানিকটা কম্পাউন্ড তারপর সেই রাস্তাটা, যেখানে ওই প'ড়ো লরিটা ছিল। কিন্তু তাতে তো বরং আরো ভাল। জায়গাটার গোপনীয়তা হয়ত মিনির যুক্তিতে তাতে আরো বেড়ে গেছে।

লরিটা যে একটা প'ড়ো লরি, আর দীর্ঘদিন ওইখানে পড়ে থাকবে, এটা জানি না কি করে মিনিও ঠিক আন্দাজ করে ছিল। ওই রাস্তায় দাঁড়ায় যে সব লরি, রাত পোহালেই সেগুলো চলে যায় তা তো মিনি দেখেছে। আর এটা যে দীর্ঘদিন এখানে পড়ে থাকবে, এটা পর্যন্ত সঠিক বুঝে, মিনি ওই লরিতেই বাচ্চা পাড়ল।

অবশ্য যে রকম গোপনীয়তা মিনির, তাতে কোনখানে বাচ্চারা আছে, তা জানাই যেত না। কিন্তু মানুষের কৌতূহল তো আরো বেশী। মিনিকে আসা যাওয়া বারে বারে করতে দেখে, বাড়ীর লোকেরা চুপি চুপি গিয়ে একবার দেখে এলো ব্যাপারটা। তারপর কোন হস্তক্ষেপ না করে, নজর রাখতে লাগল। দেখা গেল বাচ্চাগুলো ভালই আছে। আর কোন কাক-পক্ষীও টের পায় নি ওই বাচ্চাগুলোর কথা।

লরিটা কি দোষ; কেন এতদিন পড়ে আছে, কেন সারানো হচ্ছে না, এসব কেউই জানত না। তাই বাড়ীর লোকেদেরও মনে হল, যাক মিনির বাচ্চাগুলো খুব নিরাপদ জায়গাতেই রয়েছে।

সেদিন মিনি খাবার সময়ে খেতে এসেছে বাড়ীর ভিতরে; কথাটা বলছি ওর বাচ্চাগুলো জন্মবার দিন কয়েক পরের; তার পর খাওয়া শেষ করে সকলে ওপরে গিয়ে দালান থেকে দেখলে যে সেই প'ড়ো লরিটা নেই।

সবাই অবাক। ওটা চলে গেল কি করে ? তবে কি ভিতরের যন্ত্রপাতি যা খারাপ হয়েছিল, সেটা খুলে সারাতে নিয়ে গিয়ে ছিল ? সেটাই সারিয়ে এসেছে, তাই লরিটা এত দীর্ঘদিন পরে আবার চালু হয়ে চলে গেল ? আর মিনির বাচ্চাগুলো ? তাদেরই বা কি হল ? মিনি ? সেই বা গেল কোথায় ?

এত দিনের পোষা বেরালটা; সবারই মায়া ওর উপর। মিনি গেল কোথায় ? এইটাই হয়ে উঠল সকলের প্রশ্ন। কিন্তু সন্ধ্যে হল, রাত হল, মিনির দেখা নেই। বাড়ীর লোকজন সবাই এদিক ওদিক মিনির খোঁজ খবরও করতে লাগল। কিন্তু কোথায় মিনি ?

সবারই মন খারাপ। কথাবার্তা ওই মিনিকে নিয়েই। সকলেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় গেল মিনি ? আর ওর বাচ্চাগুলোরই বা কি হল ?

এমনি একদিন দুদিন করে তেইশ দিন কেটে গেল। এই তেইশ দিনের মধ্যে না মিনির, না ওর বাচ্চাদের কোন খবর পাওয়া গেল। সবাই ধরেই নিয়ে ছিল যে হয়ত মিনিটা মরেই গিয়েছে।

গেটের পাশের একটা ঘরে শিবপূজন বলে একজন হিন্দুস্থানী থাকত। সেদিন সকালে তখন চা, জলখাবারের পাটটা সবে চুকেছে, হঠাৎ দেখা গেল যে শিবপূজন ভিতরে আসছে। একটা বেরালকে কোলে করে এসে শিবপূজন আমার ছোড়দিকে বললে, "দেখুন মা, এতদিন পরে মিনি ফিরে এসেছে।"

ফিরে এসেছে সত্যি। কিন্তু একি অবস্থা তার। সিল্কের মত লোম ঢাকা, দুধের মত সাদা রঙ যেন ময়লা হয়ে গেছে। আর চেহারা ? কি মোটাসোটা ছিল বেরালটা ! এখন যেন হয়ে গেছে কঙ্কালসার। শুধু তাই নয়। যতটা উঁচু ছিল, এখন যেন তার চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে মনে হল।

শিবপূজন মিনিকে নামিয়ে দিলে। চুপ করে একজায়গায় দাঁড়িয়ে, চোখ বড় বড় করে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে চারিদিকে দেখতে লাগল, তার সেই

চিরপরিচিত ঘর-বাড়ী! বার বার সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল। দৃষ্টিটা যেন করুণ।

আমার ছোটজামাইবাবু বললেন, "আহা বেচারী কতদিন হয়ত পেট ভরে খেতে পায় নি। ওকে আগে একটু দুধ দাও।"

ছোড়দি নিজে একটা বাটিতে করে দুধ এনে ওকে খেতে দিলে। পরম আগ্রহের সঙ্গে দুধটা খেতে খেতে ও বার বার তাকাতে লাগল সকলের দিকে। এইতো তার নিজের জায়গা; যেখানে সবাই তাকে ভালবাসে।

চোখের করুণ চাউনিটা ওর মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

৩

ভিজে বেরাল মা

মাদি বেরালের মধ্যে যাদের ঘন ঘন বাচ্চা হয়, তাদের মাতৃস্নেহটা কি একটু বেশী ? এটা আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে। কিন্তু এটা ভুল না ঠিক, তার তথ্য, প্রমাণ কিন্তু যোগাড় করতে পারি নি।

অনেক সময় মনে হয়েছে, যে ঘন ঘন বাচ্চা হচ্ছে বলে ওই প্রাণীটির মাতৃস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়, এ রকম ঘটনা আমরা বেশী দেখছি, তাই ভাবছি হয়ত যে ওর মাতৃস্নেহটা বেশী।

আবার এও হতে পারে যে বাচ্চা হবার সময়টা যে কোন প্রাণীর শরীর ও মনটা এমন একটা নরম অবস্থায় থাকে, যে তখন মনের উপর, যাকে কনরাড লরেন্স ইমপ্রিন্ট বা ছাপ বলেছেন, সেটা পড়ে সহজে। মা হবার ছাপটা এমনি বার বার পড়তে পড়তে, সেটাই একটু গভীর হয়ে যায় ওই প্রাণীটির চরিত্রে।

ইথোলজি বা চরিত্রবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান, যে যাতে মনগড়া কোন কিছুকে বিজ্ঞান বলে না ভাবি, তার জন্য বার বার পরীক্ষার প্রয়োজন। বার বার লক্ষ্য করেও দেখা যায় যে মাতৃস্নেহের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কম বেশী থাকে, তারা এক প্রজাতির প্রাণী হলেও। আবার এও হয়ত সম্ভব, যে এই তথাকথিত মাতৃস্নেহ, হয়ত সেই স্ত্রী-প্রাণীটির শরীরে কোন বিশেষ হর্মোনেরই প্রভাবে। পুরুষ প্রাণীর দেহে এই হর্মোন থাকে না বলেই, শিশু-প্রাণীর উপর হয়ত তার কোন স্নেহ থাকে না। প্রজাতি হিসাবে পুরুষ প্রাণীর শিশুর উপর স্নেহ থাকা না থাকারও তারতম্য ঘটে। তবে একটা জিনিস প্রায় দেখা যায়, সদ্যজাত শিশুকে পুরুষ প্রাণী পছন্দ করুক বা না করুক, একটু বড় হলেই তাকে দলের মধ্যে কিন্তু নিয়ে নেয়।

কামারহাটিতে আমার ছোড়দির বাড়ীর মিনি বেরালটার একটু ঘন ঘনই বাচ্চা হত। প্রত্যেক বারের বাচ্চার সংখ্যা কমই থাকত, তিনের বেশী নয়। এই জন্যই হয়ত, প্রতিটি বাচ্চার উপর ভাল করে নজর দিতে পারত। এমনও হতে পারে, যে সেই কারণেই তার স্নেহটা অনেক গভীর হতে পেরেছিল।

সরকারি ফাইলপত্রের কিছু আছে, যাকে 'টপ সিক্রেট' বলা হয়। এত

৪

দুধ-মা

দুধ-মা বলে একটা কথা চলতি বাংলা ও হিন্দিতে আছে। যে মার পেটে শিশুটি জন্মেছে, যে কোন কারণেই হক, সেই মার দুধ যদি বাচ্চাটা না পায়, তা হলে অন্য কোন মা, যার বুকে দুধ রয়েছে সে দুধ খাইয়ে, স্নেহ দিয়ে শিশুটিকে পালন করতেন, তাকেই বলা হত দুধ-মা।

বর্তমানে গ্লাক্সো, ল্যাকটোজেন ও সেই সঙ্গে নানা মডেলের ফিডিং-বটলের গুণে (?) দুধ-মাদের আর দেখাই যায় না সভ্য (?) সমাজে। কিন্তু মানুষের মতন এখনও অতটা সভ্য হয়ে উঠতে পারে নি প্রাণীরা, তাই ওদের মধ্যে এখনও অনুরূপ প্রথা চালু আছে। কখনো কখনো তা দেখা যায়। অবশ্য দেখা গেলেও কমই দেখা যায়। আর তাই যদি না হত, তা হলে সেটা আর গল্প হিসাবে বলার দরকাইতো থাকত না।

যে গল্পটা বলে সুরু করছি, তা আমার বন্ধু শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কাছে শোনা। ওকে নিজের অভিজ্ঞতা হিসাবে বলেছিলেন প্রয়াত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বহু অপূর্ব গল্প-উপন্যাসের লেখক ছিলেন তিনি। তেমনি বিপুল ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা। এ গল্প বলতে গিয়ে তাঁকেই আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই গল্পের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই তাঁর বইটি, "কেউ ভোলে কেউ ভোলে না।"

গল্পটি, বা সেই সঙ্গে নিজেদের চোখে দেখা ওই একই রকমের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আরো কয়েকটি কথা মনে আসছে। মানুষের কথায় যখন দুধ-মার কথা বলছি, তখন শুধু দুধটুকু খাইয়ে দেয়ার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার হল দুধ-মার স্নেহ। মনের দিককার সেই তাগিদটা যেমন বিভিন্ন কাজে কর্মে প্রকাশ পাচ্ছে এটা লক্ষ্য করা যায়; তেমনি আবার কেউ লেখার জন্য জিজ্ঞাসা করলে দুধ-মা তার মনের ভিতরের কথাটি বলতে পারে। মানুষের মনস্তত্ত্ব চর্চায়, যাকে বলে আত্মসমীক্ষা (**introspection**) এটা তাই, ও একটা বড় ব্যাপার। আর মানুষের মনস্তত্ত্ব চর্চায়, আগেকার দিনে তো বটেই, এখনও কিছুটা এই আত্মসমীক্ষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে তো সেটা সম্ভব নয়। তাই প্রাণীদের ক্ষেত্রে যা আমরা দেখতে ও মাপতে পারি, তাকেই আমরা নেব এটাই ঠিক হয়ে গেছে।

প্রাণীদের মন, বুদ্ধি, ভাবনা, এ সব কি বা কতটা আছে, এ নিয়ে আজো তর্ক শেষ হয় নি। যদিও তাদের ভয় বা খুসী (আনন্দ) এ সব যে আছে, সেই সঙ্গে স্মৃতিও যে আছে এটা জানা গেছে। প্রাণিচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও কমই, তবু প্রাণিচরিত্র চর্চাটা হচ্ছে বহুকাল ধরে। হুইট-ম্যানের (**Whitman Ch. O. : Animal Behaviour : Woods Hole : 1898**) বইখানি ১৮৯৮ সালের হলেও আজও মূল্যহীন হয়ে যায় নি। ঠিক ওই কথাই ১৯২৩ সালে লেখা জেনিংসের (**The Behaviour of Lower Organisms : Jennings H. S. : New York 1923**) বইখানি সম্পর্কেও বলা যায়। পাখীর চরিত্র-বিজ্ঞানের বইও আছে (**Bird Behaviour : Kirkman F. B. : London 1937.**)। টোলম্যান মানুষ ও অন্য প্রাণীদের চরিত্রবিজ্ঞানকে কাছাকাছি নিয়ে এলেন তাঁর বইটিতে (**Purposive Behaviour in Animals and Men : Tolman E. C. : New York. London : 1932**)।

প্রাণিচরিত্র সম্পর্কে বই ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের তো শেষ নেই। তার চেয়ে বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেই সুরু করি গল্পটা। দল বেঁধে থাকতে অভ্যস্ত ছিল যে বন্য অবস্থায়, তার কিছু অভ্যাস আমরা কুকুরের মধ্যে দেখি। একটা পাড়ায় বেশ কিছু কুকুর থাকে। পাড়ার কুকুররা মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া ঝাঁটি হলেও, এক পরিবারের লোকেদের মত, বেশ থাকে বলতে পারি, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে থাকে। নিজেদের এলাকার মধ্যেই তারা পায়খানা প্রস্রাব থেকে সুরু করে, খাবার জোগাড় করা সবই করে। অবশ্য যে ধরনের কুকুরের কথা বলছি, এরা পাড়ার লোকেদের ফেলে দেয়া খাবার খেয়েই বেঁচে থাকে। এদের উপরে কিছুটা মায়া করেই পাড়ার লোকেরা হয়ত একটু বেশী খাবারই, বাইরে ফেলে যাতে এই কুকুরগুলো খেতে পায়। এক পাড়ার কুকুররা, বাইরে থেকে যদি কোন একটা কুকুর পাড়ায় ঢোকে, তা হলে দলবেঁধে, পাড়া থেকে তাকে বার করে না দেয়া পর্যন্ত নিস্তার দেয় না।

একগাদা পাড়ার কুকুরের মধ্যে, সাদা, হলদে, কালো সব রকম রঙের কুকুরই ছিল। প্রায় একই সময়ে, হয়ত দুচার দিনের আড়াআড়ি, একটা কালো কুকুরের আর একটা হলদে কুকুরের বাচ্চা হলো। আরও একটা মজা। কালোটার বাচ্চাদুটো কালো আর হলুদটার তিনটে বাচ্চাই হলদে হলো। এই জন্যই পুরো ব্যাপারটা মনে আছে।

কাছাকাছি শুয়ে বা দাঁড়িয়ে কালো আর হলদে কুকুর দুটো বাচ্চাগুলোকে মা-ই দুধ দিত। এও দেখতে বেশ লাগত যে হলদে মার কোলের কাছে হলদে বাচ্চা, আর কালো মার কোলে কালো বাচ্চা। রঙ ম্যাচ করা এই কালার হার্মনি দেখতে ভাল লাগত বলে সকলকেই তা দেখাতাম।

একদিন ঘটল, কালার হার্মনির বদলে কালার কনট্রাস্টের ব্যাপার। দেখি একটা হলদে বাচ্চা, কালো বাচ্চাদের সঙ্গে দিব্যি কালো মার দুধ খাচ্ছে। বাঃ কে বলে একে কনট্রাস্ট বা বিরোধ ? এই তো হল সব চেয়ে বড় হার্মনি। ব্যাপারটা সকলকে দেখালাম। আর এরপর থেকে আরো ভাল করে নজর রাখতে লাগলাম। কি আশ্চর্য ! দেখা গেল, কালো বাচ্চারা যেমন হলদে মার দুধ খাচ্ছে, হলদে বাচ্চারাও তেমনি কালো মার দুধ খাচ্ছে। বিন্দুমাত্র কালার বার নেই।

এ সম্পর্কে আমার একটা থিয়োরি আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কুকুরদের স্তনে অনেকগুলি বোঁটা থাকে। প্রায় গলার কাছ থেকে তলপেট পর্যন্ত একটি লম্বা লাইনে। এ লাইনটিকে ম্যাম্যারি লাইন বলে। সেই লাইনে এই বোঁটাগুলি থাকে। কুকুর মায়ের ছেলেমেয়ে এক এক বারে বড় কম হয় না। বাচ্চাদের কেউই যাতে দুধের অভাবে না পড়ে তাই যেন মনে হয় প্রকৃতি তাদের মায়ের স্তনে এতগুলি বোঁটার ব্যবস্থা করেছে। দেখা যায় কুকুর বাচ্চারা দল বেঁধে মার দুধ খাচ্ছে। আমার থিয়োরি হলো, কালো আর হলদে দু জনেরই বাচ্চা কম ছিল। তাই তাদের পক্ষে বাড়তি এক আধজন, অন্য কারুর বাচ্চা হলেও তাদের খাওয়াতে কোন বাধা ছিল না।

আমার থিয়োরি ভুলও হতে পারে। তাই এও সম্ভব, যে কুকুর ছানারা হয়ত প্রাচীনকালে কমিউনিটিতে বেড়ে উঠেছে। তাদের মায়েরা তাই দলের সব বাচ্চাকে প্রতিপালন করেছে। এটা আরো করতে হয়েছে হয়ত প্রাচীন-যুগে বড় বেরাল জাতের প্রাণী, যেমন বাঘ বা তাদের জ্ঞাতিদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। এই জায়গায় বাঘ বা বেরালের বাচ্চা জন্মানো আর কুকুরের বাচ্চায় তফাৎ আছে। বেরাল কি বাঘকে জন্মাবার সময় বাচ্চাদের একেবারে লুকিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু কুকুরকে তা হয় না। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে বেরালরা কুকুরদের তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক(?)। কথাটার শেষে একটা প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহার করলাম, তার কারণ এই বৃত্তিটা মানুষেরই। এই ধরনের একটা ভাব হয়ত অন্য প্রাণীদের মধ্যে থাকতে পারে।

এবার স্বর্গত শৈলজানন্দের কাছে শোনা গলপটা বলি। একটা কুকুর বাচ্চা হবার পর কি করে যেন মরে গেল। তাতে তার বাচ্চাগুলি অনাথ

হয়ে পড়ল। বাচ্চাগুলো ছোট ছোট। অন্য কোন জায়গায় গেলে যে খাবার জুটতে পারে, এটা বোঝার বয়সও তাদের হয়নি। তারা যেন না খেতে পেয়ে মরবার জন্য সেই জায়গাতেই পড়ে রইল। আর সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটল। দুধওয়ালী একটি কুকুর কোথা থেকে এসে, নিয়ম করেই যেন সেই বাচ্চাদের, নিজের দুধ খাইয়ে যেতে লাগল। তার ফলে বাচ্চাগুলি বেঁচে গেল। এ রকম একটা ব্যাপার খুব সচরাচর ঘটে না। আর ঘটলে তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা গবেষণা করতে হয়।

৫

মাদারহেন

পোলট্রির ভাষায় মাদার হেন, বলে একটা কথা আছে। অনেকদিক থেকেই যার মানে এই মুরগীগুলোকে দেখলে যারা জানে, তারা চিনতে পারবে। এরা একটু মোটাসোটা হয়। চলাফেরাটা যেন একটু আস্তে। এরা ডিম হয়ত অতটা ঘন ঘন দেয় না, কিন্তু ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর ব্যাপারে এরা একেবারে সিদ্ধহস্ত। সে ডিম না হক তার নিজের ডিম; তবু। অন্য কোন মুরগী যদি তার নিজের ডিমগুলোতে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে না চায়, তা হলে মাদার হেন, সে ডিমে বাচ্চা ফুটিয়ে দেবে।

শুধু বাচ্চা ফোটানই নয়, বাচ্চা ফোটার পর, বাচ্চারা যখন নানা রংয়ের পিংপং-এর বলের মত, চিক চিক শব্দ করে, এদিক ওদিক, মার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের কাছে কাছে রেখে, কি খেতে হবে আর কি খেতে নেই, এ সব শেখানর কাজও সেই বাচ্চাদের নিজের মার চেয়ে অনেক ভাল করে, এই মাদার হেন। শরীরে বিশেষ হরমোন প্রোজেস্টরন বা প্রোজেষ্টোজেন যাদের বেশী থাকে, তারাই মাদার হেন হয়। এরা যেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যাদের বলেছেন "মায়ের জাত", এরা তাই।

আজকাল সব ব্যাপারেই যাকে বলে, স্পেশালাজেশানের যুগ। যে মুরগী ডিম দেবার ব্যাপারে স্পেশালিস্ট, সে হয়ত বছরে তিনশো, সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি ডিম দিচ্ছে। এ কাজ ছাড়া অন্য কাছে ওদের গা' নেই। তা' দেয়া কি বাচ্চাদের সঙ্গ দেয়াটা করুক মাদার হেন। তা' দেয়ার কাজটা অবশ্য এখন করে ইনকিউবেটার। কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকা ঃ ঐ কাজটা খুবই দরকার। কনরাড লরেন্স দেখিয়েছেন যে মা যখন বাচ্চাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তখন বাচ্চাদের মস্তিষ্কে যে ছাপ বা ইমপ্রিন্ট পড়ে, তাতেই একটি প্রাণী, কিসে ভয় পেতে হবে, কি খাদ্য আর কি অখাদ্য সব শিখে ঠিক করে নেয়। কাজেই মা, বা মাদার হেনের গুরুত্ব কতটা, তা বোঝা শক্ত নয়।

ওমনি একটি মাদার হেনের গল্প বলছি। একটু গোলগাল মোটাসোটা গড়নের মুরগীটা। রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের পবিত্র তাস বংশজাতদের

মতন একেবারে পবিত্র লেগহর্ন বংশের। লেগহর্ন মুরগীকে প্রধানতঃ ডিম দেবার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই জাতের মুরগী যাকে বলে ভাল লেয়ার (layer), অর্থাৎ আন্ডা দেনে-ওয়ালী হয়। এ জন্য দেশী মুরগীর মধ্যে যত মাদার হেন পাওয়া যায়, লেগহর্নদের মধ্যে তার চেয়ে কম।

তবু এই মুরগীটা ছিল, যাকে বলে একেবারে টিপিক্যাল মাদার হেন। অন্য মুরগীর এক দঙ্গল বাচ্চা ডিমে তা' দিয়ে ফুটিয়ে তারপর তাদের সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াতে এ মুরগীটার ক্লান্তি ছিল না। শুধু ঘুরে বেড়ানই নয়। সঙ্গে যাবার সময় দেখা যেত, কোন বাচ্চা সেই মাদার হেনের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে যেন ঠোকরাচ্ছে। নিকো টিম্বারজেন তাঁর বইটিতে (**The Study of Instinct : N. Timbergen : Oxford University Press : New York, Oxford : 1974**) হেরিং গাল পাখীর সদ্যজাত বাচ্চারা এমনি করে খাবার চায় (**begging**), তা দেখিয়েছেন। আবার মা হেরিং গালরা তাদের নিজেদের গলদেশে (**Gizzard**) যে খাবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে, তাই গলার ভিতর থেকে উগরে মাটিতে ফেলে দেয়। তাতেই বাচ্চারা মাটি থেকে খুঁটে খেতে শেখে।

মাদার হেন এ সব কাজ তো করতই। কিন্তু যা নিয়ে গল্পটা, তা বলতে গেলে পটভূমিকা হিসাবে কিছু বলা দরকার। যে পোলট্রিতে এই ঘটনাটা, সেটা ছিল বোলপুরে। নেহাৎই পারিবারিক পোলট্রি। তবু ভদ্রলোক এটা করেছিলেন বেশ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। তাই এখানে দেখা তথ্যগুলি বিজ্ঞানগ্রাহ্য।

বাড়ীর উঠানটাতেই পোলট্রি। উঠানের একটা ধারে একটা গলিপথ। সেই পথ দিয়ে বাইরে রাস্তায় যাওয়া যায়। এ রাস্তা অবশ্য বড় রাস্তা নয়। তবে, এই রাস্তায় একটু এগোলে বড় রাস্তা, স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনে যাবার। বাড়ীটা স্টেশনেরই খুব কাছে।

মুরগীগুলো উঠানে চরে বেড়াত। হঠাৎ কখনো দরজাটা খোলা পেলে রাস্তায় রাস্তায়ও বেরিয়ে যেত। তখন আবার তাড়া দিয়ে ওদের ভিতরে নিয়ে আসতে হত। দরজাটা পারতপক্ষে খোলা না রাখতে চেষ্টা করলেও, কেউ যাতায়াতের সময় বা কখনো লোকজনদের ভুলে এক আধ বার দরজা খোলা থেকে যেত। আর তখন তার পুরো সুযোগটা নিত মুরগীগুলো।

যে দিনের কথা বলছি, তার দিন কয়েক আগে, চার পাঁচটা বাচ্চা সবে

ডিম ফুটে বেরিয়েছে। মাদার হেন, তা' দিয়ে বাচ্ছাগুলোকে ফুটিয়েছে। তারপর সেই সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলোকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কি করে জানি না দরজাটা খোলা থেকে গিয়েছিল। সেই ফাঁক পেয়ে মাদার হেন আর বাচ্চাগুলো বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাইরের ছোট রাস্তাটায় বিশেষ গাড়ীঘোড়ার, যাতায়াত ছিল না। তবুও একেবারে বাড়ীর ভিতরের মতন তো আর নয়। বাচ্চাগুলো ও মাদার হেন সেই রাস্তায় ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে কি যে পাচ্ছিল তা ওরাই জানে। হঠাৎ সেই রাস্তায় দু চাকার একটা হাতগাড়ী এসে গেল। ছোট গাড়ী। কলকাতায় ময়লা তুলতে যে রকম টিনের হাতগাড়ীর ব্যবহার হয়, অনেকটা সেইরকম।

বাচ্চাগুলো সব ছিল একটু ছড়িয়ে। হঠাৎ গাড়ীটা আসতে দেখে তারা ভয় পেয়ে, চারদিক থেকে ছুটে মাদার হেনের কাছে এসে গেল। আর মাদার হেনটা একটা কক্ কক্ কক্ শব্দ করে সেই সব বাচ্চাগুলোকে নিজের ডানা দুটো বড় করে মেলে ঢাকা দিয়ে দিলে। আর এই ঢাকা দেয়াটা, দাঁড়িয়ে আলগোছে ঢাকা দেয়া নয়। মাদার হেনটা পা মুড়ে, মাটির উপর একেবারে বসে পড়ে, ডানা দিয়ে বাচ্চাগুলোকে ঢেকে ফেললে। বসে পড়াটা, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। বসে পড়াটার মানে হল, যে মাদার হেন কিছুতেই সরে যাবে না। আর তাকে সরিয়েও দেয়া যাবে না। তাকে না মেরে কেউ বাচ্চাগুলোর ক্ষতি করতে পারবে না। বাংলায় একটা কথা আছে, "কারো বিপদে বুক দিয়ে পড়া" এ হল তাই। বাচ্চাদের বিপদে মা একেবারে বুক দিয়ে পড়েছে, যে করেই হক ওদের রক্ষা করতে হবে।

এ দিকে যে লোকটা হাতগাড়িটা ঠেলে নিয়ে আসছিল, মুরগীটার বা বাচ্চাগুলোর কোন ক্ষতিই সে করতে চায় নি। কিন্তু ছড়িয়ে থাকা বাচ্চাগুলোর হঠাৎ চারিদিক থেকে মার কাছে ছুটে আসা ও মার ছুটে এসে মাটিতে বসে পড়ে, ডানা মেলে বাচ্চাগুলোকে ঢাকা দেয়া, এই সমস্ত ব্যাপারের একটা হট্টগোলের মধ্যে, খুব বাঁচিয়ে চালাতে গিয়েও, গাড়ীটার একখানা লোহার চাকা মাদার হেনের ডানার উপর দিয়ে চলে গেল। তাতে কাঁধের কিছুটা একটু কেটে গেল।

কক্ কক্ কক্ করে একটা আর্ত চীৎকার শুনে বাড়ীর সবাই ছুটে এসে দেখল, প্রাণ দিয়ে না হলেও, কি করে রক্ত দিয়ে মা বাচ্চাদের বাঁচাল।

৬

কুকুরেও বলে “ আহা বাছা ”

মানুষের মনে যে স্নেহ, ভালবাসা, ইত্যাদি আছে, তা কি আমরা অন্য প্রাণীর মধ্যে দেখি ? এ প্রশ্ন করলে হয়ত অনেকে বলবেন, এ আবার কি প্রশ্ন হল ? সন্তান পালন ও তাদের রক্ষার জন্য প্রাণীরা যা করে তাকে শুধু প্রজাতিরক্ষার চেষ্টা বললেই কি সব বলা হয়ে গেল ? নিজেকে রক্ষা, প্রজাতিকে রক্ষা, এইসব চেষ্টাগুলি একেবারে স্বতঃপ্রণোদিত। নেহাৎই ভিতর থেকে আসে বলে আমরা এ গুলিকে রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত বলি।

স্নায়ুজাত ব্যাপার যা কিছু, তা যখন যেটুকু সীমার মধ্যে থাকার কথা, তা ছাড়িয়ে গিয়ে উপচে পড়ে, তখনই সেগুলোকে আমাদের অভিধানের কথা খুঁজে, মানুষকেও খুব ভালভাবে মানাবে, এমন কথায় বলতে হয়। এই করতে গিয়ে, কত ভাল কথা আমাদের হাতে এসে গেছে : প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, দরদ, মনের টান, এমনি আরো কত। অথচ এ সবগুলিতে একই ধরনের মনোভাব।

মানুষের স্নায়ুজগৎ-জাত যে মন, তার সব চেয়ে বড় কথাই হলো প্রাচুর্য। যা আছে, তাই অনেক বেশী আছে বলে যেন উপচে পড়ে। এই উপচে পড়া জিনিস দিয়েই গড়া শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান সব। কিন্তু সেগুলোর কথা থাক। আমাদের ছেলেমেয়েদের তো আমরা ভালবাসিই। সেটা তো হল প্রজাতিরক্ষা। কিন্তু সেই সঙ্গে পোষা কুকুর, বেরাল, টিয়াপাখী, এদেরও সব কি ভালই বাসি।

এইসব নানান কথাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের চরিত্রে কি ভালবাসা নামের তথাকথিত পরিবর্তের উপর কোন প্রাচুর্য নেই ? হয়ত আছে। কিসে এই কথাটা মনে হল, সেই গল্পতেই আসি।

সেটা ছিল একটা ছুটির দিন। বাতাসে একটু শীতের আমেজ। অথচ ঠিক শীতটা পড়ে নি। আমাদের বাড়ীর সামনের পিচঢালা রাস্তাটা পরিষ্কার, চক্ চক্ করছে। কেমন যেন একটা মন্থরতা। রাস্তায় গাড়ী

ঘোড়া তো নেইই। এমনকি লোক চলাচলও করছে না। আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটা, ছোটখাট রাস্তা। দেশপ্রাণ শাসমল রোড থেকে পূর্ব দিকে একটা নাম-হয়নি এমনি রাস্তায় বাড়ীটা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তাটার পূর্বদিক বরাবর নজর করলাম। একেবারে ফাঁকা রাস্তাটার, আমাদের বাড়ী থেকে ত্রিশ চল্লিশ ফুট এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে মুখোমুখী দুটো কুকুর বসে। আমাদের পাড়ারই কুকুর দুটো। রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কুলীন জাতের নয়। তবু কুকুরগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গা গুলো চক চক করছে।

কুকুর দুটোকে দেখে মনে হল, বাঃ বেশ তো। এমন একটা দিনে, আলসেমিটুকু উপভোগ করার চমৎকার জায়গাটা বেছেছে তো। আমরা যে রকম আড্ডা দেবার জন্য মুখোমুখী হয়ে বসি, ওই কুকুর দুটোও তেমনি মুখোমুখী হয়ে শুয়ে। দুজনের মাঝখানে ফুট দেড়েক জায়গা।

কুকুর দুটোকে লক্ষ্য করার পরই আমার নজরটা রাস্তার অন্য একটা জায়গায় পড়ল। ঐ জায়গাটা প্রায় আমারই বাড়ীর নিচে। দেখি সেখানে একটা সদ্যজাত বেরালছানা। তার সবে চোখ ফুটেছে ও এক পা এক পা করে হাঁটতে শিখেছে। তার মাকে ধারে কাছে দেখলাম না। জানি না কেন। বেরাল বাচ্চাটা এক পা এক পা হেঁটে এগুচ্ছে। আবার হেঁটে চলেছে দেখি, যে দিকে ওই কুকুরগুলো শুয়ে রয়েছে সেই দিকে।

ওর চলা দেখে, প্রথমটায় আমি ভাবলাম, ওইটুকু একটা শিশু বেরাল, কি সোজা এক লাইনে হেঁটে ওই কুকুরগুলোর কাছ অবধি পেঁছবে ? এমনি হয়ত আবার উল্টোদিকে হাঁটতে সুরু করে নিজের মা যেখানে, সেই দিকে যাবে। কিন্তু না তো। দেখি বেরালছানাটা ঠিক একই লাইনে হেঁটে ওই কুকুরগুলোর দিকেই চলল।

এত দূর থেকে কিছুই করার নেই বলে, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, যে বেরালটা সদ্যজাত। কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। তাই সে জানে না যে কুকুর বেরালের কত বড় শত্রু। কচি এই বেরালছানাটাকে একবার থাবার নিচে পেলে, কুকুর দুটো এক চাপড়ে শেষ করে, ওকে চিবিয়ে খাবে। অথচ এতটা দূর থেকে, বেরাল ছানাটাকে বাঁচানোর জন্য আমার কিছুই করার নেই। তাই আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

বাচ্চাদের হাসাবার জন্য, আমরা তাদের হাতে ডাল দিলাম ভাত দিলাম, এই রকম একটা গল্প বলে, তার পর তাদের হাতের মণিবন্ধ থেকে আমাদের দুটি আঙ্গুলকে আস্তে আস্তে ওরই হাতের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে এনে

বাচ্চাদের বগলের তলায় কাতুকুতু দি। আঙুল দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার সময় বলি—মিনি গুটি গুটি যায়, মিনি গুটি গুটি যায়। ঠিক ওই রকম। গুটি গুটি করে হেঁটে বেরালছানাটা কুকুর দুটোর কাছে পোঁছে গেল। কাছে বলে একটু কমই বলা হল। একেবারে মুখের কাছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! প্রথম কুকুরটা, যার একেবারে মুখের কাছে বেরাল-ছানাটা গিয়ে পড়েছে, সে তাকে ভাল করেই দেখল, এমনকি ওর মুখে গায়ে নাক ঠেকিয়ে, বেশ ভাল করে শুঁকে দেখল, কিন্তু কিছুই বললে না। কোন ক্ষতি করলে না, তাড়া দিলে না, শুধু বার কতক শুঁকে, ওমনি চুপ-চাপ বসে রইল।

আর বেরালছানাটাও তেমনি। প্রথম কুকুরটার সঙ্গে ওর মুলাকাৎ শেষ করেই, ও এগোল অন্য কুকুরটার দিকে। অন্য কুকুরটারও ওই একই আচরণ। বেরালছানাটাকে বেশ ভাল করেই শুঁকে দেখল, কিন্তু কোন ক্ষতি করল না। বেরালছানাটা তখন ওর পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাঁচলাম বটে; কিন্তু আমার মনে অনেক প্রশ্ন। প্রজাতিগত ভাবে কুকুর বেরালের শত্রু। কিন্তু তবু এ বেরাল বাচ্ছাটাকে কুকুর দুটো কিছুই বললে না কেন ? আবার শুধু একটা কুকুরের এই আচরণ হলে, বলতাম ব্যাপারটা হয়ত কাকতালীয়। কিন্তু দুটো কুকুরেরই আচরণবিধিতে কোন তফাৎ নেই।

প্রজাতিগতভাবে কুকুর ও বেরালের যে ঝগড়া, তা হাজার বছরের পুরানো। মানুষ যখন শিকার করত দলবদ্ধ ভাবে, তখন নেকড়ে জাতের প্রাণীরা তাদের ফেলে দেয়া হাড়ের টুকরো, মাংস এই সব খেতে আরম্ভ করলে। মানুষরাও দেখল, বাঃ বেশ তো। এদের পোষ মানাতে পারলে, শিকারের সুবিধা। তা ছাড়া রাতে, বাঘের মত বড় বেরাল জাতের প্রাণী ও অন্য প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে আগুন করে রাখা হয়, তা নিভে গেলে, এই প্রাণীরা চেঁচিয়ে সজাগ করে দিতে পারবে।

এমনি করে কুকুর পোষ মানল, আর হল প্রজাতিগত ভাবে বেরাল জাতের সব প্রাণীর সঙ্গে কুকুরদের শত্রুতা। তবু তো দেখলাম চোখের সামনে, সেই বেরাল জাতের এক বংশধরকে, একজন নয় দুজন কুকুর ঠিক একই ভাবে, খাবার নিচে পেয়েও ছেড়ে দিলে। কিন্তু কেন ?

যে সব বাড়ীতে পোষা কুকুর আছে, তাদের আচরণ থেকে দেখা যায় যে কোন কোন লোক বাড়ীতে পদার্পণ করলে, কুকুরটা যেন বেশী চেঁচায়। আবার অনেকেই এ ও লক্ষ্য করেছে, যে যারা কুকুরকে ভয় পায়, কুকুরও যেন তাদের দেখে বেশী ঘেউ ঘেউ করে। কে ভয় পেয়েছে আর কে ভয় পায় নি, কুকুর তা টের পেলে—কি করে পায় ? চেহারা দেখে কি ? কিন্তু যে কোন লোক যতই ভয় পাক, পায়নি যে, এটাই চেহারায় দেখাতে চেষ্টা করে। তা ছাড়া কুকুরের দৃষ্টিতে ভয়ের লক্ষণগুলো লুকোবার চেষ্টাটাও ধরা পড়ে যাবে, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তা হলে ?

কোন প্রাণী যখন ভয় পায়, তখন তার লোম খাড়া হয়ে ওঠা, ঘাম দেয়া, চোখের তারা বড় হয়ে ওঠা, এমনি অনেক কিছু হয় শরীরে এ্যাড্রেনীল গ্রন্থি থেকে এ্যাড্রেন্যালিন রক্তে সঞ্চালিত হয় বলে, শরীরে ওই সব পরিবর্তন হয়। শরীরের মধ্যে থেকে বার হওয়া অনেক কিছুরই যেমন বিশেষ গন্ধ আছে, তেমনি এ্যাড্রেনালিন যে সব পরিবর্তন করে, তার একটা গন্ধের দিকও আছে। যেমন বলা যায় ঘামের কথা। এ গন্ধ মানুষের কাছে ধরা না পড়লেও, কুকুরের কাছে ধরা পড়ে। কারণ ওদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের তুলনায় অজস্রগুণ বেশী। তাই কুকুররা হয়ত কেউ ভয় পেলে গন্ধেই তা টের পায়। ব্যাপারটায় স্থির সিদ্ধান্ত করার আগে অনেক গবেষণা দরকার।

সদ্যজাত বেরাল ছানাটার কথায় আসি। মার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার অভিজ্ঞতা তো তার ছিল না। তাই সে শেখে নি যে কুকুরকে ভয় পেতে হয়। একেবারে ভয় না পাবার জন্য হয়ত কুকুর দুটো ওকে শুঁকে শুঁকে, ওর ভয় পাবার কোন চিহ্ন না পেয়ে ওকে ছেড়ে দিল।

অনেকে হয়ত বলবেন, গন্ধের কথা না হয় গেল। কিন্তু এমন তো দেখা যায় আখচার, যখন অনেক দূর দিয়ে একটা বেরাল যেতে দেখে কুকুররা তাকে তাড়া করে। করে; কিন্তু সেখানে বেরালের ভয়টা তো একজন অন্ধও দেখতে(?) পাবে।

এই গল্পের সুরুতে অনুভূতির উপচে পড়ার অধিকন্তু ভাবটার কথা বলেছি। সেইটুকুতেই যেন সৌন্দর্য। এখানে সেই কুকুরদুটো বেরালছানাটার কোন ক্ষতি না করে, সেই অধিকন্তু ভাবটাই দেখাল। একে কি বলব ? সদ্যজাত বেরালছানাটার উপর অনুকম্পা ? আমরা সত্যিই জানি না !

৫।

কেন ওরা বদলায় রূপ, বদলায় রঙ

যখন উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যার পাঠে কারুর হাতে খড়ি হয়, তখন প্রথম তাকে মরফলজি বা অঙ্গসংস্থান বিদ্যাটা শিখতে হয়। এর কারণ হল প্রাণী আর উদ্ভিদরা পলিমর্ফিক বা বিচিত্র-আঙ্গিক। এমনকি একই প্রজাতির ভিতরে শরীর-গঠন-বৈচিত্র্য বা পলিমর্ফিজম কত। কেন এমন হয় ? এর উত্তরটা কিন্তু সহজ। ঐ সবই হয় বাঁচারই তাগিদে। শরীর গঠন বৈচিত্র্য বিবর্তনকে সাহায্য করেছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গুগলি, শামুক ইত্যাদি প্রাণীর দেহের বাইরের যে শক্ত খোলসটি আছে, সেটাই তাদের ভিতরের নরম দেহটাকে বাঁচায়। কিন্তু তাতেই কি রক্ষা ? পাখীরা অনেকেই এদের শরীরের নরম মাংস খেতে ভালবাসে। কিন্তু বাইরের শক্ত আবরণটাই তার বাধা। তাই জন্য পাখীরা শামুকগুলোকে ঠোঁটে করে ধরে, সেগুলোকে কোন শক্ত পাথরে ঠুকে ঠুকে ভাঙে, আর তা না হলে অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়ে, পাথরের উপরে ফেলে ভাঙে।

পাখীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এদের শরীরগঠন-বৈচিত্র্য বা পলিমর্ফিক হয়ে উঠেছে। দেখা যায়, এদের শরীরের খোলার রঙ, সেই জায়গার পাথরগুলোর মতন। এটা হওয়াতে অনেক সময় পাখীরা এদের দেখতে না পাওয়ার জন্য এরা বেঁচে যায়। কোন কোন শামুকের খোলসে অপূর্ব শিল্পকর্মের মত ছিট বা ডিজাইন দেখা যায়। এ সব রকমের শরীর-গঠনবৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য একটিই ঃ প্রাণীটিকে বাঁচতে সাহায্য করা।

প্রজাপতির কত বিচিত্র রঙ। ফুলকে প্রজাপতি আর প্রজাপতিকে ফুল বলে যে ভুল হয় এটা প্রজাপতিকে বাঁচতে তো আর কম সাহায্য করে না। কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়। এমন অনেক প্রজাপতি আছে, যাদের ডানায় বড় বড় চোখ আঁকা। আর এ চোখগুলো এমন ভীষণ দর্শন যে দেখলেই ভয় করে। প্রজাপতি খায় যে সব পাখী, তারা ওই ভীষণ চোখ দেখে আর সেই জাতের প্রজাপতির ধারেই এগোয় না।

যে ধরনের প্রজাপতির কথা বলছি, তারা এমন চোখের ডিজাইন ডানাতে পেল কি করে ? এইখানেই বিবর্তনের প্রশ্ন। বিবর্তনে চোখের ডিজাইনের

কাছাকাছি একটা ডিজাইন ডানাতে এসে যাওয়াতে ওই জাতের প্রজাপতির বাঁচতে সুবিধা হল। সেই প্রজাপতিরাই প্রকৃতির হাতে নির্বাচিত হয়ে শেষে, রক্তচক্ষু-ডানা প্রজাপতির বিবর্তন ঘটল।

আচরণতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায় যে প্রজাপতিদের চেহারার এই পরিবর্তনে, তাদের খাদক যারা, সেই পাখীদের আচরণের পরিবর্তন হল। যে প্রজাপতিরা পটভূমিকার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারে, তাদের খুঁজে বার করবার জন্য, এই সব পাখীরা আরো নিচে উড়তে সুরু করল, যাতে মাটির কাছাকাছি থেকে এই লুকিয়ে থাকা প্রজাপতিদের দেখতে পায়। এইভাবে খাদ্যের চেহারার পরিবর্তনে, খাদকের আচরণের বদল হল বাধ্যতামূলক ভাবে।

প্রজাপতিদের শরীরগঠনের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের কথা আলোচনা করলাম। সামুদ্রিক প্রাণী অক্টোপাসেরও অনুরূপ শরীরে রূপবৈচিত্র্য ইচ্ছামত আনার ক্ষমতা আছে। মেরুদণ্ডহীন এই সামুদ্রিক প্রাণীর শরীরটা একেবারে নরম। অবশ্য এরা খুব চটপটে ও অনেক প্রাণীর তুলনায় বুদ্ধিমান। এটা ওদের সাহায্য করে খুবই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য এরা অনেক কিছু করতে পারে। এরা আক্রমণকারী প্রাণীদের ভয় দেখানর জন্য, তাদের দিকে খুব তোড়ে জল ছুঁড়ে দিতে পারে। তা ছাড়া শত্রুদের ভয় দেখানর জন্য জলে কালি ঢেলে দেয়। কালির মত এই জিনিসটি, এরা শরীরের ভিতর তৈরী করে। এ জিনিসটা বিষাক্ত ও দুর্গন্ধ। তাতে শত্রু প্রাণীরা আরো ভয় পায়।

এ ছাড়াও আরো নানা উপায়ে অক্টোপাসরা তড়িঘড়ি চেহারা বদলাতে পারে। প্রথম হচ্ছে রঙ বদলানো। সমুদ্রের বালির মত রঙ এরা করতে পারে নিজেদের। যখন বালির কাছে আসে তখন এই রঙ। আবার সন্ধ্যায় যখন রৌদ্রের আভা লাল হয়ে ওঠে, তখন এরা গায়ের রঙ লাল করে ফেলে। এ্যাকেয়েরিয়ামে রাখা অক্টোপাসের উপর টর্চ থেকে লাল, নীল আলো ফেলে ওদের এইরকম রঙ বদলাতে দেখেছি। এই ক্ষমতাটা ওদের সরীসৃপ জাতের বহুরূপীর মতন। শুধু তফাৎটা হল অক্টোপাসরা এই রঙের পরিবর্তনটা করতে পারে আরো অনেক তাড়াতাড়ি।

রঙ বদলানো ছাড়াও অক্টোপাসরা শরীরের উপরের দিকে চোখের মত কালো বড় বড় ডট তৈরি করতে পারে। এইগুলো দেখেও সমুদ্রের অন্য প্রাণীরা ভয় পায়। এ ছাড়া জেব্রার গায়ে যে রকম সাদা কালো ডোরা থাকে,

ঠিক সেই রকমেরই গা'টাকেও ওরা করতে পারে। গা'টাকে এ রকম ওরা করে আক্রমণ করার আগে।

শত্রুদের হাত থেকে অনেক সময় অক্টোপাসরা বাঁচার জন্য, নিজেদের পা গুলোকে উপর দিকে করে এমন ভাবে থাকে যে মনে হবে, কোন গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে। এই ভেবে আর কেউই তাদের আক্রমণ করে না। আত্মরক্ষার জন্য রঙ বদলানো কি জেব্রার মত গায়ে ছিট ছিট রঙে সাজা, এই অস্ত্রগুলি শুধু আত্মরক্ষা বা আক্রমণেরই অস্ত্র নয়। এই অস্ত্রগুলিরই ব্যবহার হয় জীবন সাথী নির্বাচনে, অর্থাৎ প্রেমে। জীবনসাথী নির্বাচন বলতে কেউ যেন মনে না করেন যে অক্টোপাসরা জীবনে মাত্র একবারই জীবনসাথী বেছে নেয়। তা মোটেই নয়। কিন্তু অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই যেমন দেখা যায়, যে পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর প্রেমের আগেটা যেন যুদ্ধের আয়োজন, একটা যুদ্ধ হক বা নাই হক। প্রেমের খেলায় যেন একটা উভয়লীনতা (**ambivalance**) থাকে।

গঠনবৈচিত্র্যের কথায় আবার ফিরে আসি। আমরা জানি কোকিলরা নিজেরা বাসা করে ডিম পেড়ে, তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায় না। তারা ডিম পেড়ে যায় কাকের বাসায়। কাকই সে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করে। বড় হয়ে ডাকতে শিখলে, তখন সে নিজেই উড়ে চলে যায়। কোকিল সারা পৃথিবী-তেই দেখা যায়। আর শুধু কাকের বাসাতেই নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন বহু পাখী আছে, যাদের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে। আর বিভিন্ন পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে বলে, কোকিলের ডিমের গঠন বৈচিত্র্য যে কত হতে পারে, তা দেখিয়েছিলেন জুলিয়ান হাক্সলি।

অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলির একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম গঠনবৈচিত্র্য ও বিবর্তন সম্পর্কে। এই ভাষণে তিনি শুধু কোকিলের ডিমই পৃথিবীর বিভিন্ন পাখীর বাসায়, কত বিচিত্র আয়তন, গড়ন, রঙ ও ছিটের হতে পারে, তার ছবি দেখিয়েছিলেন। শুধু তাঁর নিজের সংগ্রহেই ষাট, সত্তর রকমের ডিমের রকমফেরতার ছবি তিনি দেখিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কোকিলের ডিম পাড়ার সময় কি রকম বুদ্ধি করে, সে সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার কাকার বাড়ীটা আমাদের পাশে। সেখানে একটা বেলগাছ আছে। এই গাছে কাকেরা নিয়ম করে বাসা করে। আমাদের দোতলার উপরের সিঁড়ির ঘরের পাশের ছাদ থেকে কাকেদের বাসা, এমনকি তার ভিতরে কতগুলো ডিম রয়েছে তা দেখা যেত। একবার দেখলাম চারটে ডিমই রয়েছে। চারটে বাচ্ছাও হল। তার পর দেখি একটু

বড় হয়ে একটা বাচ্চা কুউ কুউ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে, আর কয়েকটা কাক তাকে তাড়া করেছে। বুঝতে পারলাম, কখন চুপি চুপি কোকিল এসে, কাকের বাসার একটা ডিম ফেলে দিয়ে, নিজের একটা ডিম পেড়ে রেখে গিয়ে ছিল। আবার প্রকৃতিরও কি ব্যবস্থা ! কোকিল এক বাসাতে বেশী ডিম না পেড়ে, ভাগ করে পাড়ে। তাতে বাচ্চাদের পালাতে ও বাঁচতে সুবিধা হয়। কোকিলের এই পরজীবী সুবিধাবাদ, যেন প্রায় মানুষেরই মত। কাকের ডিম ফেলে দিয়ে, নিজেরা ডিম পাড়ে।
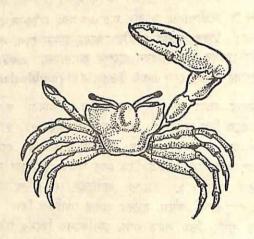
শরীরের গঠনবৈচিত্র্যের আর একটি উদাহরণ দি। এটি ফিডলার কাঁকড়ার। ফিডল হল বেহালা। নামটা এত লাগসই হতে বড় দেখা যায় না। এই কাঁকড়ার দাড়াগুলির মধ্যে বাঁ দিকের দাতওলা দাড়াটা এত বড় হয় যে তার ওজন প্রায় পুরো কাঁকড়ার ওজনের সমান। এত বড় দাড়া, এই সাইজের কাঁকড়ার পক্ষে যেন বেমানান। এমনকি মনে হয়, যেন এটা বোঝা। কিন্তু ফিডলার কাঁকড়ার পক্ষে এর দুটি প্রয়োজন। এক নম্বর হল, এত বড় দাঁড়া দেখে ভয় পাবে না, এমন বুকের পাটা কোন প্রাণীর আছে ? আর পুরুষ কাঁকড়ার দাঁড়া যত বড় হবে, স্ত্রী কাঁকড়ার ততই তার উপর টান বেশী। এখানেও সেই যুদ্ধের হাতিয়ারেই মেয়েদের আকর্ষণ।

তবে এর একটা বিপদও আছে। বিবর্তনে এই দাঁড়া যদি আর একটুও বাড়ে, তা হলে অস্ত্রের ভারেই যোদ্ধার গুষ্টি (প্রজাতি) শুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে !

৮

পশুর আচার থেকে মানুষের আচরণে

পশুপাখীদের আচরণবিধি থেকে যে জ্ঞান আমরা পাচ্ছি ও ভবিষ্যতে পাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তার প্রয়োগমূল্য কতটা? অর্থাৎ তার কতটা আমরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারব? অনেকে বলেন, এ ব্যবহার অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছবে। কারণ তাঁদের মতে, মানুষের আচরণবিধি বুঝতে হলে ও তাকে নিজেদের কল্যাণের পথে চালাতে হলে, পশুপাখীদের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান চাই। কারণ মানুষ শুধু নয়, তার আচরণ পর্যন্ত, প্রাণীদের স্তর থেকে বিবর্তিত হয়েই তো এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তাতে কোন দোষত্রুটি থাকলে, তা সেই অতীতের উত্তরাধিকার। এটা অন্য প্রাণী, যারা বিবর্তনে আমাদের আগে এসেছে, তাদের কাছ থেকে পাওয়া। কোথা থেকে রোগের উৎপত্তি হল, তা না জানলে কি আর রোগের চিকিৎসা হয়? আর মানুষের আচরণের ত্রুটিগুলোর চিকিৎসা করতে হলে, এ সব জানা চাই।

সিংহ, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি শিকারী প্রাণীর আচরণ নিয়ে হর্নোকার, ক্রাংক, মূরি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা বহু গবেষণা করেছেন। লরেন্স ও টিম্বারজেনের শিষ্য হিসাবে এঁদের এ সব কাজ, মানব সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণাতেও প্রভাবিত করবে।

যে সব বৈজ্ঞানিকদের নাম করলাম, তাঁদের গবেষণা থেকে সিংহ, নেকড়ে, হায়না ও অন্য শিকারী প্রাণীরা, সামাজিক ভাবে, দল বেঁধে, কি রকম করে একটু বড় জাতের শক্তিশালী প্রাণীদের শিকার করে তা দেখান হয়েছে। ক্রাংক, টিম্বারজেনের সম্মাননার জন্য যে বিশেষ বইখানি প্রকাশ করা হয়েছে, সেই বইয়ের একটি বিশেষ প্রবন্ধে শিকারী প্রাণীদের দলবন্ধ ভাবে শিকার ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

তিনি বলছেন যে আমিষভোজী প্রাণীদের সামাজিক সংগঠন দেখে মনে হয়, যে এ ধরনের সংগঠন প্রাণিজগতে হয়ত বিবর্তনে বার বারই দেখা গিয়ে থাকা সম্ভব। প্রাণী খাদ্যশৃঙ্খলা বাঁধা। খাদ্য কি করে পেতে হবে, সেই ব্যাপারের ইতর বিশেষের উপরেই প্রাণীর জীবনযাত্রা ও তাদের সামাজিক

গড়ন নির্ভরশীল। বিবর্তনে যে ন্যাচার্যাল সিলেকশান বা প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে, সেই নির্বাচনী শক্তির পিছনেও খাদ্য-শৃঙ্খল কাজ করতে থাকে। কাজেই এ কথা মনে করা যেতে পারে যে খাদ্য-শৃঙ্খলটা একরকমের হলে, ভিন্ন প্রাণীদের মধ্যেও এক রকমের সামাজিক সংগঠনও থাকবে।

প্রাচীন মানুষ তো আর নিরামিষ ভোজী বৈষ্ণব ছিল না। তারা ছিল মাংসাহারী। আর যে সব প্রাণী শিকার করে তাদের মাংস ওরা খেত, তারা সব ছিল বড় সাইজের। মানুষের চেয়ে বড় ও দ্রুতগামী ছিল এই সব প্রাণী। যে প্রাণী যত বড়, তাকে শিকারের দলও তত বড় হতে হবে। যেমন যে হায়নারা বাইসন বা বন্য গরু শিকার করে, তাদের দলটা যদি বেশ বড় না হয়, তা হলে শিকার তো ফসকাবেই, এমনকি যে আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে, সেই মার খেয়ে যাবে।

সেইরকম, প্রাচীন মানুষ যখন ম্যামথ কি বুনো হাতী শিকার করত, তখন খুব বড় দল না হলে তা সম্ভব হত না। বড় দলে শৃঙ্খলা, সহযোগিতা এ সব তো দরকার হতই, এমনকি কি করতে হবে না হবে, তা জানানোর জন্য, পারস্পরিক ভাব বিনিময় করতে, ভাষাও দরকার ছিল। হায়না, বুনো কুকুর, সিংহ এরা সকলেই দলবেঁধে শিকার করবার সময় চীৎকার করে। অবশ্য প্রাণীদের চীৎকারের আর একটা কারণও থাকে। যতদূর অবধি তার চীৎকার পৌঁছল, ততদূর তার এলাকা। বাঘ, সিংহের গলার জোরটা বেশী, তাই তাদের এলাকাও অনেক দূর অবধি।

পাঁচজনের সঙ্গে কি করে মানিয়ে চলতে হবে; তাও মানুষ শেখে, এই-রকম দল বেঁধে শিকার করতে গিয়ে। সিংহরাও যে এটা শেখে, তার প্রামান্য তথ্যচিত্র তুলেছেন ওয়াল্ট ডিজনি, তাঁর' আফ্রিকান লায়নে'। পৃথিবীর কোন জায়গার সভ্য মানুষের সে ছবি দেখতে বাকি নেই। এই ছবিটিতে ডিজনি দেখিয়েছেন, যে বেশ কয়েকটি সিংহী ও একটি সিংহতে মিলে একটি ইউনিট। শিকার করার সময়, একটি বা কয়েকটি ইউনিট একসঙ্গে দল বেঁধে শিকার করে। দলটা কতবড় হবে, সেটা নির্ভর করে শিকারের উপর। জিরাফ, জেব্রা, বাইসন, সবই একটু বড় জাতের, আর খুবই দ্রুতগামী। তা ছাড়া এরা থাকেও দলবেঁধে। কাজেই প্রথমে সিংহরা গর্জন করে ও একসঙ্গে তাড়া দিয়ে, প্রাণীদের দলছুট করে নেয়। তারপর চারিদিক থেকে ঘিরে মারার চেষ্টা করে। তা না হলে জিরাফ, জেব্রারা এত দ্রুতগামী, যে তাদের পক্ষে পালান অসম্ভব নয়।

ডিজর্নি দেখিয়েছেন, কি রকম সুন্দর একটা সহযোগিতা থাকে এদের মধ্যে। একজনের কাজ, অন্যের কাজের পরিপোষক হিসাবে কাজটাকে সাহায্যই করে। সিংহরা একটু কুড়ে। নেহাৎ দরকার পড়লে তবেই সিংহী-দের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। শিকার ধরার সময় যে রকম সহযোগিতা, খাবার সময়ও তেমনি সকলে ভাগ করে খায়।

এই সব ভাল করে লক্ষ্য করলে মনে হয়, এদের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে, মানুষের সমাজব্যবস্থার কিছু মিল আছে। যেমন মানুষও খাবার ভাগ করে নেয়। নিজেদের থাকা কিম্বা শিশুদের প্রতিপালনের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে রাখে মানুষও। শিকারী হিসেবে, মানুষের সমাজের যে বিবর্তন ও ক্রমোন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে অন্য প্রাণীদের চেয়ে, দলবেঁধে থাকে এমন আমিষভোজী প্রাণীদের বেশী মিল দেখা যায়।

যেমন মানুষের মধ্যে আক্রমণকারী মেজাজের (**aggresive**) দল (**gang**) দেখতে পাওয়া যায়। এরা দল বেঁধে মারপিট, ছিনতাই, ইত্যাদি অনেক কিছুই করে। এদের আমরা নেকড়ের সঙ্গে তুলনা করি। ঐ তুলনাটা শুধু কথার কথাই নয়, প্রাণিতত্ত্ব ও আচরণতত্ত্বের দিক থেকে এদের হায়না কি নেকড়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ইংরাজি ভাষায় কিছু ছোকরাকে যে "উল্ফ" বলা হয়ে আসছে, তারও কারণ ওই। একদল পুরুষ হায়না বা নেকড়ে দলবেঁধে শিকার করে, দলবেঁধে নিজেদের এলাকায় কারুকে ঢুকতে দেয় না (যাকে মাস্তানির মতনই বলা যায়)। বিবর্তনে কি করে এ আচরণ ওই সব প্রাণীদের মধ্যে দেখা গেল, তা জানলে তবেই হয়ত আমাদের পক্ষে উন্মার্গগামী তরুণদের বোঝা ও তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রাণীদের আচরণবিধি চর্চায়, মানবচরিত্র সংশোধনের সম্ভাবনার কথা অনেকেই স্বীকার করতে চান না। তাঁদের কথা হচ্ছে, প্রাণিচরিত্র আর মানবচরিত্র দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। তাই এ দুটির চর্চা করতে হবে, আলাদা আলাদা ভাবে।

কিন্তু মনে হয়, উপরের মতটা একটু একপেশে। বিজ্ঞান যদি একপেশে মনোভাব নেয়, তা হলে তা আর বিজ্ঞান থাকবে না; না তাকে প্রয়োগ করা যাবে সমাজের কল্যাণে। আজকের নতুন বিজ্ঞান সাইবারনেটিকসে একটি কথা আছে ফিড-ব্যাক। এ কথাটি আজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বলতে পারা যায়, প্রাণী আচরণবিজ্ঞানের ফিড-ব্যাক, মানুষকে সুসংবদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

৯

পশুপাখীদের ভাষা, লিপি

জানি না কেন শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে শাস্ত্রে। তবে শব্দের অসাধারণ ক্ষমতা আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করি। "লক্ষ্য করি" কথাদুটির জায়গায়, লিখতে গিয়েছিলাম "দেখি"; কিন্তু তা থেকে নিজেকে জোর করে ঠেকালাম। কারণ শব্দ তো আর দেখা যায় না, তা শুনতে হয়। অবশ্য কথা, যা উচ্চারিত হতে হবে শব্দে, তা দেখার উপযুক্ত অক্ষরে লেখা, ছাপা, এমনকি কোরিওগ্রাফী পাথরে কুঁদেও রাখা যায়। চীন, জাপানের কাঞ্জি লিপি তো ছবি দেখবার অক্ষর। তবু কথা নয়, এমন শব্দ, যেমন শিশুদের কান্না, পাখীর গান, বাতাসে পাতার খসখসানি, এ সব ?

আজ কিন্তু এ সবও চোখে দেখা দেবে, এমন ভাবে কাগজে ধরা পড়ছে প্রায় অক্ষরের মত। শব্দের চিত্ররূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে কি করে ? ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে যখন কোন শব্দ ধরা হয়, তখন শব্দটা কি জাতের, তার উপর নির্ভর করে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই বিদ্যুতের সাহায্য নিয়ে সামান্য শব্দকে অনেক জোরালো করা যেতে পারে। এটা করা হয় লাউডস্পিকারে। আবার তার বদলে, ওই বিদ্যুৎই বিশেষ একটি কালি লাগানো কলমকে কাগজের উপর চালিয়ে, ওই সব বিশেষ বিশেষ শব্দের রূপটার ছবি নিতে পারে। প্রত্যেকটি শব্দের তফাৎ যেমন শুনে বোঝা যায়, তেমনি শব্দের এ রকম ছবিও আলাদা করে চেনা যায়। এমন কি আমরা যদি ছোটবেলা থেকে শিখতাম, তা হলে হয়ত শব্দের ওই ছবিগুলোই আমরা পড়তে ও লিখতে শিখতাম।

বিজ্ঞানে শব্দের এ রকম ছবির ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন পাখীর ডাক, এমনকি বিভিন্ন রোগে শিশুদের কান্না, তারও তফাৎ আছে। রোগ নির্ণয়ের পক্ষেও যে এ ছবির ব্যবহার যে সম্ভব, তাও দেখা গেছে। জীববিজ্ঞানী মার্লার বিভিন্ন জাতের বানর ও বিভিন্ন পাখীর, এইরকম শব্দের ছবি তুলে, বিভিন্ন অবস্থায় তার তফাৎটা দেখিয়েছেন।

এ বিষয়ের আলোচনায় আমাদের সর্টহ্যান্ড লিপিরও একটু আলোচনা

করা উচিত হবে। এখানে পিটম্যানের সর্টহ্যাণ্ডের কথারই সামান্য আলোচনা করছি। তবে তা করার আগে সর্টহ্যাণ্ডেরও একটু আলোচনা করি। তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য, সর্টহ্যাণ্ডে শব্দ বা কয়েকটি শব্দের একসঙ্গে একটা সহজ প্রতিলিপি তৈরি করে নেয়া হয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে টকি ফিল্মের সাউণ্ড ট্র্যাক, বা এইমাত্র যে ধরনের শব্দের ছবির কথা বললাম, তার সঙ্গে পিটম্যানের সর্টহ্যাণ্ডের মিল থাকবে। কিন্তু তবু কৌতূহল হিসাবে এর তুলনা করছি।

বানরের ডাকের যে ছবি মার্লার (Marler. P.) দিয়েছেন, সেগুলি পিটম্যানের "ডি" লিপির মত, মোটা লাইন সোজা উপর থেকে নিচে। শুধু একবার শব্দ করেই থেমে যায় না। তা বার বার করতে থাকে। আর যদি মার্লারেরই ছবিতে চড়াই জাতের কিছু পাখীর শব্দের ছবিগুলি পিটম্যানের লিপির সঙ্গে তুলনা করি, তা হলে পিটম্যানের চেয়ার, চিয়ার, চাইল্ড, এই এই লিপিগুলির কাছাকাছি ছবি পাই। অবশ্য চড়াই জাতের এ পাখী ঐ শব্দ একবারই শুধু করে না। বার বার "চিক" "চিক" করে ডাকতে থাকে।

পিটম্যানের অক্ষর ডি . ড্ . ডে . ডা	মার্লারের ছবি টি, চি --------
পিটম্যানের চেয়ার	মার্লারের চিক্ চিক্ চিক্

চড়াইয়ের শব্দলিপির সঙ্গে পিটম্যান লিপির মিল থাকাটা হয়ত একেবারেই কাকতালীয়। কারণ পিটম্যান তো আর এই শব্দগুলির বৈদ্যুতিক যন্ত্র মাধ্যমে তার লিপিচিত্র কি হবে, তা দেখে লিপি তৈরি করেন নি। কিন্তু শব্দের চিত্রলিপি আজ হাতের কাছে থাকায়, বিভিন্ন শব্দের তুলনামূলক ও পরিমাণগত দিকটা খুলে গিয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে পাখী বন্য, তাদের ডাকটা ছাড়া ছাড়া। যেন টুকরো টুকরো শব্দ দিয়ে তৈরি। সে জায়গায়, যে পাখী মানুষের হাতে বড় হয়ে উঠেছে, তার ডাকটা একটানা মতন।

ক্যানারিও চড়াই জাতের পাখী। ক্যানারি পাখীর ডাকটা খুবই সুন্দর। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে ক্যানারির এ ডাক তাদের নিজস্ব নয়, এটা তাদের বাপ মার কাছে শেখা। যদি ক্যানারির ডিম ইনকিউবেটারে ফুটিয়ে, সেই বাচ্চা পাখীদের মানুষের কাছে বড় করে তোলা হয়, তা হলে সেই

পাখীদের ডাক অন্যরকম হয়। কিন্তু ক্যানারি পাখীরা যদি সেই ডিমে তা দিয়ে ফোটায় ও তারপরই যদি বাচ্চাদের সরিয়ে দেয়া হয়, তা হলেও সেই বাচ্ছারা ক্যানারিদের মতই ডাকে। এ থেকে একটা কথা মনে হয় ঃ তা হলে কি ডিমের মধ্যে থেকেই অভিমন্যুর মত পাখীরা শ্বনতে পায় ? হাঁ পায়। গটলিবের (Gottlicb) পাখী সম্পর্কে যে বই আছে তাতে তিনি দেখিয়েছেন, যে ডিমের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থাতেও হাঁস ও ম্বরগীরা শ্বনতে পায়। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বলি।

ম্বরগীর ডিমের ভিতরের ভ্রূণদের উপর কয়েক রকমের পরীক্ষা আমাদের করতে হত। ভ্রূণগ্বলি স্বস্থ অবস্থায় থেকে, ঠিক ঠিক ভাবে নড়াচড়া করছে কি না তা আমাদের অন্ধকার ঘরে, ডিমগ্বলোর উপরে বিশেষ ভাবে আলো ফেলে, দেখতে হত। দেখেছি যে ভ্রূণগ্বলি একটা বিশেষ ভাবে নড়া চড়া করে। কাজ করতে করতে হয়ত একটু জোরে কথা বলতে হত। দেখেছি জোরে কথা বললে ভ্রূণগ্বলি যেন চঞ্চল হয়ে উঠত। আবার মহিলা কণ্ঠে এটা বেশী হত। তার কারণ হয়ত এ ও হতে পারে যে মেয়েদের স্বর সর্ব (হাই পিচ); আর মোরগ ও ম্বরগীদেরও তাই। সেইজন্য মহিলা কণ্ঠ শ্বনলে ওরা আরো বেশী চঞ্চল হত।

প্রাণী মাত্রেই নিজের এলাকা সম্পর্কে সজাগ। নিজের এলাকায় অন্য কার্বর অন্বপ্রবেশ তারা পছন্দ করে না। এর এলাকা চিহ্নিত করার জন্যও প্রাণীদের নানা রকমের নিয়মও আছে। একটি প্রাণী যতটা এলাকা জ্বড়ে পাইখানা বা প্রস্রাব করে, সেই এলাকায় তার শরীরের গন্ধ থাকে। তাতেই সেই এলাকাটা তার বলে চিহ্ন করা হয়ে যায়। একটা পাড়ার কুকুররা, সকলেরই দেখা, এইভাবে নিজেদের এলাকার উপর অধিকার বজায় রাখে।

বাঘ, সিংহের মত শিকারী প্রাণীদের বেশী এলাকা দরকার শিকারের জন্য। তাই তারা নিজেদের এলাকা ঠিক করে নেয় গলাবাজি বা গর্জনে। যতখানি তাদের গলা পেঁছিল, ততটা তাদের এলাকা। এও দেখা গেছে, যে অন্য একটা বাঘ, হয়ত শিকারের পিছনে তাড়া করতে করতে, অপর এক বাঘের এলাকায় এসে গেছে। সেই এলাকার বাঘের গর্জন শ্বনে, বে-এলাকার বাঘ তখন নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

পাখী উড়তে পারে। তাই তার এলাকা অনেক বড়। শিকার বা খাদ্য পাবার জন্য পাখীর এতবড় এলাকা দরকার হয় না। দরকার তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী পেতে, যার সঙ্গে সে বাসা বাঁধবে, ডিম পেড়ে বাচ্চাদের বড় করে

তুলবে। পাখী তার গলার আওয়াজ ছড়িয়ে দিয়েই এ কাজ করে। তাই প্রকৃতি পাখীর স্বরকে তার দেহায়তনের তুলনায় অতি বিচিত্র, সুন্দর ও বহুদূর পৌঁছানর উপযুক্ত করেছে। সেই সঙ্গে পাখী পেয়েছে তার কানও। সেই জন্যই ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, গ্রে প্যারট, ম্যাক, শালিক এমনকি কাক পর্যন্ত মানুষের কথা বা অন্য শব্দ, সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারে। আর মহারথ অভিমন্যুর মত ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তার কান, শেখাবার জন্য তৈরি !

১০

কাকবাসা ও কাকেরবাসা

"কাকবাসা" বলে একটা কথা আছে। সেটা শ্রীহীনতা বোঝাতেই ব্যবহার হয়। একজন মহিলা যখন বলেন, যে তাঁর মাথাটা একেবারে কাকের বাসা হয়ে রয়েছে, তখন তিনি বোঝাতে চান, যে সেটার সবচেয়ে আগে প্রয়োজন প্রসাধনের। সত্যি কাকের বাসাটাই এ রকম। একটা শ্রীহীন ছন্নছাড়া ভাব তার গঠনে। কিন্তু কেন ?

অবশ্য কাকেদের সম্পর্কে একটা কথা বলা যায়। সেটা হল যে কাকেরা খুব শহুরে পাখী। তা হলে কি বলব, শহুরে হতে গিয়েই ওরা, অন্ততঃ ওদের বাসার শ্রী হারিয়েছে ? চট করে কিছু বলার আগে, পুরো ব্যাপারটা একটু ভাল করে চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখতে হয়।

আমরা সুরু করি বাসা তৈরির মাল মশলা নিয়ে। পাখীদের স্বাভাবিক বাসস্থান হল গাছপালা বন। কারণ তাদের স্বাভাবিক খাদ্য হল বনের ফল, সবুজ ঘাস পাতা খেয়ে বাঁচে যে পতঙ্গ। তা ছাড়া যদি জলের কাছে কোন পাখীর স্বাভাবিক বাসস্থান হয়, তা হলে মাছ, জলের পোকা, জলের অন্য ছোট প্রাণীরাও এই সব পাখীদের খাদ্য। রোজকার থাকার জন্য, বাসার খুব একটা প্রয়োজন না হলেও ডিম পাড়া ও তা থেকে বাচ্চা ফুটে বাচ্চা একটু বড় হবার জন্য বাসার প্রয়োজন।

ডিমগুলি হয় গোল গোল। এই জন্য খুব সহজে গড়িয়ে পড়ে ভেঙে যেতে পারে। তাই পাখীর বাসাটা প্রয়োজনের খাতিরেই একটা ধামা বা ঝুড়ির মত করা হয়, যার মধ্যিখানটা নিচু, ধারগুলো উঁচু। এ রকম গড়নের হলে, ডিমগুলো গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে না। তা ছাড়া যখন বাচ্চা হয়, তারা পড়ে যায় না ও চার পাশ থেকে ঠান্ডা হাওয়া বাচ্চাদের গায়ে লাগতে পারে না। সব পাখীর বাসার মূল কাঠামোটা এই। এমনকি ঠিক মোজা বোনার মতন করে বোনা বাবুই পাখীর বাসারও ভিতরের কাঠামোটা এই।

গাছে বাসা না করে, মাটির উপরে ঘাস পাতা সাজিয়ে বাসা তৈরি করে, এমন পাখীও আছে। এর একটি হল হেরিং গাল। এরা জলের কাছাকাছি

থাকে। বাসা করবার সময় এরা, একটা এলাকা চিহ্নিত করে, সেই জায়গাটা খুব ভাল করে চিনে নিয়ে, বাসা করে ডিম পাড়ে।

জীব বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যদি ডিমগুলিকে বাসা থেকে মাত্র একফুট দূরে মাটিতে রেখে বাসাটা খালি করে দেয়া হয়, কিন্তু তবু বাসাটা পাখীর এত চেনা যে, সে একফুট দূরের ডিমগুলোকে তা না দিয়ে খালি বাসাটাতে তা দেবে। অথচ তারা যে কাছের জিনিস দেখতে পায় না তা নয়। কিন্তু হাঁসের উপর অন্য এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাসার পাশে, কাঠের তৈরি ঠিক ওদেরই ডিমের মত বড় সাইজের ডিম রাখলে, হাঁস ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে সে ডিমটা বাসায় নিয়ে যায়। ছোট ডিমের চেয়ে বড় ডিমই যেন পছন্দ বেশী।

মাটিতে বাসা করা ও বাসা থেকে ডিম চুরি যাবার যে পরীক্ষার কথা বললাম, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে মাটির তুলনায় গাছে বিপদ অনেক কম। বিপদ এড়িয়ে বাঁচতে গিয়েই একদিন বিবর্তনে সরীসৃপ থেকে পাখীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সে আলোচনা এখন এখানে থাক। বাঁচার তাগিদই যদি হয়, তা হলে তো গাছের উপরের বাসাটাকেও শক্ত করতে হয়। সে কথা বলতে হলে আবার কাকের বাসার কথাই এসে যায়।

বাসা তৈরির মাল-পত্র, সেই যাকে বলে কাঠ-খড়, এগুলি শহুরে মানুষদের

ওই কাঠ খড়ই অনেক পুড়িয়ে তবে জোগাড় করতে হয়। কোথায় লোহা, কোথায় ইট, কোথায় সিমেন্ট, কোথায় এ সবের পারমিট ? কাকও তো এখন একটা শহুরে পাখী, তাই তাদেরও অনেকটা এই ধরনের জিনিসপত্র বাসায় লাগতে সুরু করেছে। অবশ্য একটা গুরুতর ব্যতিক্রম আছে। আমাদের যেমন হয় জিনিস পয়সা খরচা করে কিনতেও পারমিট বা অনুমতি-পত্র লাগে; কাকেরা সব কিছু অনুমতি ছাড়াতো বটেই, এমনকি আমাদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও জোগাড় করে ফেলে।

কাকের বাসায় কি কি জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তার একটা তালিকা দিলে মন্দ হয় না। এর মধ্যে অনেকগুলিই আমার দেখা ও কতকগুলি শোনা। কাকেরা সাধারণতঃ বাড়ীর ধারে কাছে কোন গাছে বাসা করে। কাজেই কিছু জিনিস পাড়ার এ বাড়ী ও বাড়ীর হারালে, তখন পাড়ার ছেলেরা একসঙ্গে কাকের বাসা খানাতল্লাসী করেছে। অবশ্য তখন শয়ে শয়ে কাক, কা কা করে ওদের ঠোকরাতে যায়। কিন্তু পাড়ার ছেলেরাও দলবদ্ধ। ওদের হাতে গুলতি, ছড়ি, ছটরার বন্দুক। তাই তল্লাসী পুরো নেয়া গেছে। কি কি পাওয়া গেল তাই বলি।

পাওয়া গেছে ঃ ১। সোনার হার ২। রূপার ঘড়ির চেন ৩। সোনার আংটি ৪। কাঁচের ও পাথরের গুলি ৫। চামচে ৬। হাতা ৭। খুন্তি ৮। হাতঘড়ি ৯। ইলেকট্রিকের তার ১০। লোহার ও তামার তার ১১। জুতার ফিতে ১২। জুতার সুখতলা ১৩। রবারের গার্টার ১৪। ছোট পকেট আয়না ইত্যাদি। খানাতল্লাসী চালিয়ে গেলে ঐ তালিকা কত বড় হবে তা বোঝা যায়। তবু এই তালিকাটা থেকে কি ধরনের জিনিসের চাহিদা তা বোঝা যায়। বেশীর ভাগ জিনিসগুলি মজবুত অথচ নমনীয়। সোনার হার ও রূপার চেন, ঠিক ওই জন্যই, সোনা রূপার দরের জন্য অবশ্যই নয়। আংটি কি গুলি নিয়েছিল কিজন্য জানি না। তবে আমার মনে হয়, গোল জিনিসটা সহজে নড়ে বলে, কাকেরা হয়ত সেটাকে স্থিতিস্থাপক ভাবে।

যাই হক, এবার কাকেরা বাসা করার সময়, আমার নিজের একটি পরীক্ষার কথা বলি। বাসা করার সময় কাকেরা কাঠি কুটি সংগ্রহ করছে দেখে, আমি আমাদের ছাদে পাশাপাশি সমান সংখ্যায় তারের টুকরো ও নারকোল ঝাঁটার কাঠি রেখে দিলাম। এই দু রকমের জিনিসই সমান লম্বা ও মোটা। দেখলাম দু রকমের কাঠিই ঠোঁটে করে তুলে, পা ঠোঁট ও ছাদে ঠুকে দেখে কাকেরা কাঠির তুলনায় তারের টুকরোগুলি বেশী পছন্দ করতে লাগল। অবশ্য

একটিও ঝাঁটার কাঠি যে তারা নিলে না, তা নয়। তবে সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশী নিলে তার।

উপরের পরীক্ষার সমর্থন হিসাবে আর একটি ব্যাপার দেখলাম। আমাদের সামনের বাড়ীর রোয়াকে ঝাঁটার কাঠি, ছেঁড়া ঘুড়ির কাঠি, এই রকম অনেক জিনিস পড়ে ছিল। আর ছিল তাদের জানলার গরাদেতে লাগান একটা তার। এ তারের একটা দিক খোলা। খোলা দিকটা রোয়াকের উপর ঝুলছিল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, যে কাকগুলো বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে, ওই তারটাকেই টানাটানি করতে লাগল। বহু চেষ্টা করে খুলতে পারে না। টানাটানি করে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার এসে চেষ্টা করে। তবু পাশে পড়ে থাকা কাঠিগুলোর উপর ঝোঁক নেই।

শহরের যান্ত্রিকতায় কাকেদের মজবুত জিনিসের উপর ঝোঁক বেড়েছে; এ কথা বলা যাবে কি না জানি না, তবে তাদের আচরণের এইদিকটিতে নজর দিতে হবে, ও তার কারণও ভাল করে বুঝতে হবে।

১১

আল্লাদি

নামটা কিন্তু কোন একটা মেয়েরও হতে পারত। এ নামটা একটা মুরগীর। তার ডাকার সময়, কি তার সম্পর্কে বলার সময়, নামটাকে উচ্চারণ করা হত ঃ আল্লাদি। বেশ বোঝা যায় নামটা আদরের। কিন্তু এত আদরই বা তার হল কেন ? বলে না কি আদর হল গুনেরই। তা হলে তার গুণের কথাটাই নয় বলি।

যেমন মানুষ হয়। একজনের সঙ্গে আর একজনের আকাশ পাতাল তফাৎ। জীবজন্তুদেরও তাই হয়। প্রাণী মাত্রেরই একেবারে নিজের একটা চরিত্র থাকে। এই চরিত্র অনুযায়ী, কেউ কম, আর কেউ বেশী করে আমাদের ভালবাসা পায়। কুকুর, বেরাল এমনকি মুরগীদের মধ্যে পর্যন্ত এমন এক একটি প্রাণী থাকে, যে জোর করে ভালবাসা আদায় করে নিতে জানে। আল্লাদি ছিল ঠিক এইরকম মুরগী।

চাকরি উপলক্ষে আমার ছোড়দি ছোটজামাইবাবু তখন থাকতেন বোলপুরে। বাড়ীর উঠোনেই ওদের একটা ছোটখাটো পোলট্রি ছিল। হরিণঘাটা ও টালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট পোলট্রি থেকে ভাল নৈকষ্য কুলীন জাতের সদ্য ফোটা মুরগীর ছানা নিয়ে, তাদের প্রতিপালন করে ও'রা বড় করে তুলতেন। এইরকম ভাবেই বড় হয়ে উঠিছিল আল্লাদি।

গোড়া থেকেই আল্লাদির স্বভাবটা যেন একটু অন্য রকমের। যে মুরগী-মা ছিল ওই ছানাদের প্রতিপালিকা, আল্লাদি যেন তার সব চেয়ে কাছে কাছে থাকত আর ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তাতে যেন মনে হত, যে ওদের পালিকা মার সঙ্গেও যেন আল্লাদির সম্পর্কটা সব চাইতে ঘনিষ্ঠ। এমনি করেই দেখতে দেখতে আল্লাদি বড় হয়ে উঠল।

বড় হয়েও এই মিশুক স্বভাবটা যেন আল্লাদির বেড়েই গেল। মানুষেরও কাছ ঘেঁসা হয়ে উঠল সে। আমার ছোটজামাইবাবু হাতে করে চারটি গম নিয়ে মোরগ, মুরগীদের খাওয়াতেন। খাওয়াবার সময়, গমগুলো ছড়িয়ে দেবার আগেই, আল্লাদি ও'র হাত থেকেই খেয়ে যেত। এমনকি কোলের

উপর কি হাতের উপর উঠে বসত। ওর এই নির্ভয় আদর কাড়তে চাওয়া স্বভাবের জন্যই ওর নাম দেয়া হয়েছিল আহ্লাদী।

শুধু যে সময়েই আহ্লাদি ভাব করত তা নয়। ছোটজামাইবাবু অফিসে চলে গেলে, ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে, আমার ছোড়দি কোন সময় উঠানের দিকে এলে, আহ্লাদি ওমনি কাছে এসে, মুখের দিকে তাকিয়ে কক্ কক্ করে ডাকত। তখন ছোড়দিও ওর গায়ে, পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিত। এটাও আহ্লাদি খুব উপভোগ করত। উঠানের কোলে দালান; তার সামনে ঘর। কিন্তু অকারণে ঘরে ঢুকে এসে আহ্লাদি বিরক্ত করত না। যেন তাতে মনে হত, সাহস ওকে অসংযমী করে তোলে নি।

লেগহর্ণ জাতের মুরগীদের মত মুরগীদের এমনই করে তোলা হয়েছে বিবর্তনমূলক নির্বাচনে, যে তারা আজ যেন ডিম দেবার যন্ত্রবিশেষ। প্রায় প্রতিদিনই ডিম দিয়ে বছরে আড়াইশো তিনশো ডিম, এরা অনায়াসে দেয়। বেশী ডিম যারা দেয়, তাদের বলে ভাল লেয়ায় (**layer**) বড় হয়ে আহ্লাদিও হয়ে উঠল খুব ভাল লেয়ার।

সেই বলে না, যাদের ভাল হয়, তাদের সবই ভাল হয়। আহ্লাদিও যেন সেই রকম হয়ে উঠল। কিন্তু বড় হয়েও ওর স্বভাবটা বদলানো না মোটেই। এমন কি যেন আরো মধুর হয়ে উঠতে লাগল। ছোটজামাইবাবু অফিস যেতেন সাইকেলে। ফিরে আসার সময়, উঠানের পাশে যে গলি, সেই দরজা দিয়ে ঢুকতেন। দরজাটা খুলে দেবার জন্য, পথের উপর থেকেই সাইকেলের বেলটা বাজাতেন। বেলটা শুনেই আহ্লাদি বুঝতে পারত যে উনি আসছেন। টের পেয়েই ও এগিয়ে যেত গলিটার দিকে। দরজা খোলার পর, ছোটজামাই-বাবু সাইকেলটা হাতে নিয়ে গলির ভিতর ঢুকলেই, আহ্লাদি উড়ে গিয়ে সাইকেলের রডের উপর বসবে। তারপর সাইকেলে চড়েই গলি ও উঠানটুকু পার হয়ে ওর দালানের কাছ অবধি আসা চাই। এখানে এসেই সে সাইকেলের হাতল থেকে নেমে আসবে।

কিন্তু নেমে এসেই সে ছোটজামাইবাবুকে ছেড়ে দেবে না। সে আবার বসবে হয় ও'র কাঁধে, আর না হয় তো হাতের উপর। তার পর তক্ষুনি চারটি গম চেয়ে নিয়ে, আহ্লাদিকে খাইয়ে তবেই ছুটি। এমনকি অফিসের কাপড় জামা ছাড়ার পর্যন্ত অবকাশ নেই, ওকে চারটি গম খাওয়া-নোর আগে। এইরকম গায়ে পড়া স্বভাবের জন্য আহ্লাদিকে যেই দেখত, সেই ভাল বাসত। তা ছাড়া একটা মুরগীর সব চেয়ে বড় যে গুণ, বেশী ডিম দেয়া, সে ব্যাপারেও আহ্লাদি ওই দলের আর সব মুরগীগুলোর থেকে থাকত

এগিয়ে। এগিয়ে বললে কম বলা হয়; বলা উচিত কয়েক লেংথে এগিয়ে। আর শুধু যে ডিমের সংখ্যাতেই এগিয়ে, তা নয়। আল্লাদির ডিমের সাইজও ছিল তেমনি বড়।

কারো কোন গুণের জন্য যদি কেউ লোকের ভালবাসা পায়, তার নাম ডাক হয়, তা হলে কোন কোন মানুষ,—আর তাদের সংখ্যাই হল বেশী—বেশ একটু সজাগ হয়ে ওঠে। এই মনোভাবটাকেই আমরা বলি, আত্মসচেতন মনোভাব। যারা আত্মসচেতন মানুষ, তাদের চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, সব কিছুতেই এ ভাবটা যেন ফুটে ওঠে। অন্য প্রাণীদের এ রকম মনোভাব(?) দেখা যায়, এ কথা বললে, তা প্রমাণ করা যাবে না। তবু এ রকম প্রায়ই দেখা যায় যে একটা মোরগ কি একটা ঘোড়ার হাঁটা, চলা পুরো চালচলনটাই যেন একটু সুন্দর আর দৃষ্টিও বেশী আকর্ষণ করে। লরেন্স কি টিম্বারজেনের মত বৈজ্ঞানিকরা এর নাম দিয়েছেন ডিসপ্লে (**display**)। বাংলায় একেই আমরা বলতে পারি প্রদর্শনী, মানে দেখানো।
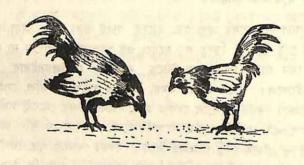
ময়ূর যখন পেখম ধরে নাচে, তার মূল উদ্দেশ্যটা হল ময়ূরীকে তার দিকে আকর্ষণ করা, এটা আমরা সকলে জানি। এমনকি মেঘ দেখেও যখন ময়ূর পেখম ধরে, তখনও একটা ভিন্নতর উত্তেজনা, সেই একই আচরণে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে, এ কথা বলা যায়। আল্লাদির চাল ও চলনের মধ্যেও ঠিক এইরকম একটা ডিসপ্লে বা রূপ দেখানোর ভাবটা থাকত খুবই।

একটা দিনের একটা ঘটনার কথা বলে আল্লাদির গল্পটা শেষ করি। সেদিন বিকেল বেলায় ছোটজামাইবাবু অফিস থেকে একটু সকাল সকাল ফিরেছেন। আল্লাদি যথারীতি সাইকেলের রডে চড়ে, উঠান পার হয়ে রোয়াক পর্যন্ত এলো। তারপর নিয়মমাফিক ছোটজামাইবাবুর হাতের উপর বসল, গম খাবার জন্য। রোয়াকের উপর একটা খাটিয়া পাতা থাকত। আল্লাদিকে

খাওয়াবার জন্য চারটি গম চেয়ে নিয়ে সেই খাটিয়ার উপর ছোটজামাইবাবু বসে আল্লাদিকে গম খেতে দিচ্ছেন। বেশ খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ছোটজামাই-বাবুর মনে হল, কোলের উপর কি যেন একটা পড়ল। চেয়ে দেখেন একটা মস্ত বড় ডিম।

আমার ছোড়দিকে ডেকে ছোটজামাইবাবু বললেন, "দেখ, দেখ, আমার কোলের উপর আল্লাদি একটা ডিম পাড়ল; আর দেখ কত বড় ডিম।" যে বাড়ীর কাজ করত তাকে ডেকে ছোড়দি বললেন, খুসী হয়ে, "শঙ্করা, ডিমটা তুলে রেখে দে তো।"

আল্লাদি দেখিয়ে দিলে যেন, তাকে গম খাওয়ানো কি আদর করা সার্থক।

১২

পিঁপড়ে উইপোকা ইত্যাদি

কথাটা ছোটবেলা থেকেই শোনা। মানুষের সভ্যতা যদি না থাকত; কিম্বা যদি আজ মানুষের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে পিঁপড়ে বা উইপোকাদের সভ্যতাই নাকি এ পৃথিবী জুড়ে থাকবে। এর কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে এই ধরনের কিছু কিছু ছোট ছোট প্রাণীদের সামাজিক সংগঠন, বেশ একটু উঁচু স্তরের। এই জন্যই নাকি ওই আশা; কি বোধ হয় বলা ভাল, সম্ভাবনা। আশা কথাটা লিখেও যেন কথাটা সম্বরণ বা প্রত্যাহার করলাম, তার কারণ, মানুষের সভ্যতা থাকবে না, এটা তো ভাবি না। তাই মানব সভ্যতা চলে গেল, আর চলে গিয়ে, অন্য কোন প্রাণীর সভ্যতা সুরু হল, এটা তো সম্ভব নয়, তাই কথাটা প্রত্যাহার যে করেছি এটা দেখানও দরকার তাই আশা কথাটা সম্ভাবনার সঙ্গে রেখেই দিলাম।

যারা গোলাপের বাগান করেছেন, তাঁদের দেখা আছে যে সেই গোলাপের বাগানে একরকমের সবুজ পোকা হয়। এই জাতেরই কালো রঙয়ের পোকাও আছে। এদের বলে এফিস (**aphis**)। এই জাতের পোকারা, গাছের ভিতর থেকে প্রচুর পরিমাণে গাছের রস চুষে, নিতে পারে। নিজেদের পুষ্টির জন্য এই রস এদের নিতে হয়, প্রচুর। কিন্তু এই রসের মধ্যে যতটা চিনি থাকে, তার সবটা এদের নিজেদের লাগে না। না লাগা চিনির রসটা এদের পিছনে ও তলায় জমা হয় ফোঁটা ফোঁটা মধুর মত। এই রসের ফোঁটাগুলো গাছের পাতায় লেগে গিয়ে জমে। কিছু রস জমে গাছের গা দিয়ে ঝরে, গাছের গা গুলোও চটচটে করে দেয়। ফোঁটা ফোঁটা রস মাটিতেও পড়ে।

এই পোকারা এত রস টেনে নেয়, যে গাছ পর্যন্ত এতে জখম হয়ে মরে যেতে পারে, যদি এ পোকাদের তাড়াবার ব্যবস্থা না করা হয়। আমরা এদের তাড়ানোর ব্যবস্থা না করলেও, সে ব্যবস্থাটা করে পিঁপড়েরা। দেখা যায়, যে গাছে এফিস পোকা বাসা নিয়েছে, সেই গাছে পিঁপড়ের সার। তবে পিঁপড়েদের লক্ষ্যস্থল কিন্তু এই এফিস পোকারা। শরীরের মিষ্টি রস হল পিঁপড়ের খাদ্য। মিষ্টি রস এফিসের শরীর থেকে দুয়ে নিতেও পিঁপড়েরা জানে। আমরা যে রকম গরুর দুধ দুই, পিঁপড়েরাও ওমনি নিজেদের শুঁড় দিয়ে

এফিসদের পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। সুড়সুড়ি দিলেই ওদের শরীরের বাড়তি রস বেরিয়ে আসে। আর সেগুলো পিঁপড়েরা খেয়ে নেয়। আবার এই এফিস পোকারাও, এত বেশী রস খেয়ে নেয়, যে তাদের শরীর একেবারে পিপের মত ফুলে যায় আর আপনি আপনিই সে রস বার হয়ে যায়। কাজেই পিঁপড়েদের এই "গরু" যে বেশ "দুধওয়ালা" তা বোঝা যায়।

পিঁপড়েরা শুধু যে এদের রসই খায়, তা নয়। নিজেদের ঘরে এদের নিয়ে গিয়ে পোষে। আমরা যেমন গরুগুলোকে চরাতে মাঠে নিয়ে যাই, পিঁপড়েরা তেমনি এফিসগুলোকে আবার গাছে গাছে বসিয়ে দেয় রস খাবার জন্য। এমনকি কোথায় বেশী রস পাবে, সেই বুঝে ওদের গাছের ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়।

প্রথমটায় মনে হবে যে এতে লাভটা বুঝি একতরফা পিঁপড়েদেরই। কিন্তু তা মোটেই নয়। এফিসরাও পিঁপড়েদের দেখাশোনায় ভাল থাকে। তারা বেশী বাঁচে, বাচ্চা কাচ্চা বেশী হয়। এদের শত্রুদের হাত থেকেও পিঁপড়েরাই এদের বাঁচায়। আবার যে গাছের রস খেয়ে এফিসরা বাঁচে, সে গাছের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, এ জন্য একটা জায়গা থেকে বেশী রস চুসতে না দিয়ে, পিঁপড়েরা ওদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাছের বিভিন্ন জায়গায় বসায়।

যে সভ্যতায় গোপালন আছে, সেখানে গোশালা বা গোগৃহও দেখা যায়। যে রকম আর কি ছিল মহাভারতে বিরাট রাজার। এফিসদের জন্য পিঁপড়েরাও মাটির গুঁড়ো, মুখের লালা, এই সব দিয়ে থাকার ঘরও বানিয়ে দেয়। এদের কিছু রাখা হয় মাটির তলায়, আর কিছু ঘর থাকে মাটির গায়ে। মাটির তলার ঘরে এফিসদের ডিম হতে দেয়, যাতে সে ডিমগুলো পাখী বা অন্য পোকায় না খেয়ে যায়। বাচ্চা হলে তখন পিঁপড়েরা এদের আবার চরাতে নিয়ে যায় গাছে।

পিঁপড়েদের এই পশুপালন পদ্ধতি বোঝবার জন্য অনেক পরীক্ষা

হয়েছে। বৃটেনেই শুধু চল্লিশ রকমের এফিস দেখা গেছে। সব রকমের পিঁপড়েই যে এ রকম পশুপালক তা নয়। তবে পিঁপড়েদের খাবার আনা-নেয়ার সময়, পরষ্পরের সঙ্গে সহযোগীতা করতে দেখা যায়। একটি পিঁপড়ে যদি খাবার সংগ্রহ করে, তা হলে দেখা যায়, তার মুখের খাবারের অংশ সে অন্য পিঁপড়েকে বেশ সহযোগীতার সঙ্গে দেয়। এটা দেখা যায়, দু দিক থেকে দুটো পিঁপড়ে যাবার সময়, শুঁড়ে শুঁড়ে ঠেকিয়ে একটু দাঁড়ায়, এটা আমরা সবাই দেখেছি।

আর একটা জিনিস দেখেও তখন তার মানে বুঝি নি। পরে বার্টনের বই পড়ে মানেটা বুঝলাম দেখেছি একটা পিঁপড়ের সারের, আধ ইঞ্চিটাক উপরে উপরে একটা মশা উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এ মশারা ওই পিঁপড়েদের মুখের মিষ্টি রস খাবার জন্যই ওড়ে। আর তা পায়ও।

নীল প্রজাপতির বাচ্চা যখন শুঁয়াপোকা অবস্থায়, তখন এদের সঙ্গেও পিঁপড়েদের সহযোগীতা থাকে। এই শুঁয়াপোকার শরীরের মাঝখানের কিছু গ্রন্থি থেকে মিষ্টি মিষ্টি রস বেরোয়। এদের দেখতে পেলে, পিঁপড়েরা ওদের পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। সুড়সুড়ি দিলে ওরা মিষ্টি রস বার করে। পিঁপড়েরা সেই রস খায়। অনেক সময় যেখানে এই জাতের শুঁয়াপোকা আছে, সেই গাছের তলায় পিঁপড়েরা বাসা করে। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, শুঁয়াপোকার এ রস খাদ্য নয়, নেশার জিনিস। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের মত এই পিঁপড়েরা আবার নেশাও করে। যে নীল শুঁয়াপোকার রস খেয়ে পিঁপড়েরা নেশা করে, এই শুঁয়াপোকাদের নিজেদের বাসায় ঠাঁই দিলে কিন্তু পিঁপড়েদের বিপদ আছে। ওরা পিঁপড়েদের ডিম খেয়ে ফেলে। কিন্তু তবু ওদের শরীরের রস খাবার নেশাটা এমন হয়ে যায়, যে এ ক্ষতি স্বীকার করেও ওরা এই নীল প্রজাপতির শুঁয়াপোকাদের পোষে। এ দিক থেকে দেখলে, পিঁপড়েদের চরিত্রের এ দুর্বলতাগুলোও যেন ঠিক মানুষের মত। কে জানে, হয়ত সমাজ সংগঠনের জটিলতা যখন বাড়ে, তখন আনুষঙ্গিক কিছু দোষও তখন দেখা দেয়। তার ফলাফল অবশ্য অনেক দূর অবধি গড়ায়।

উইপোকার জীবনযাত্রা, সমাজসংগঠন এ সবের সঙ্গে পিঁপড়ের সব কিছুরই মিলটা এত বেশী যে উইপোকাকে ইংরাজিতে বলে হোয়াইট এ্যান্ট (**white ant**)। ভারতের আদি সভ্যতার সঙ্গেও যে উইপোকার যোগাযোগ ছিল না, তা নয়। ভারতের আদি কবি বাল্মীকি যখন তপস্যা করছিলেন,

তখন তাঁকে নাকি ঢেকে ফেলেছিল এক বল্মীক বা উইঢিপি। তাই থেকেই তাঁর নাম হয়ে গেল বাল্মীকি।

আদি কবি যেমন প্রাচীন, তেমনি পোকাদের মধ্যে উইপোকাও খুবই প্রাচীন। পৃথিবীর প্রথম পোকাদেরই বংশধর হল এরা। পিঁপড়েদের মত এদের সমাজব্যবস্থাটাও খুব ভালভাবে সংগঠিত। এদের সমাজও শ্রেণীবিভক্ত। তিনটি শ্রেণী এদের ঃ রাণী, রাজা আর শ্রমিক। আর কোন কোন বিশেষ সমাজে আর একটি শ্রেণীও এদের আছে, এটি হল যুদ্ধ করবার জন্য সৈনিক শ্রেণী। সৈনিকদের কাজ হল ওদের ঘর বাড়ী বাঁচান।

ঘর বাড়ীর কথা যে বললাম, কোন কোন বিশেষ জাতের উইপোকাদের ঘরবাড়ী এত বড় আকারের হয় যে তাকে একটা ছোটখাট পাহাড়ই বলা চলে। উইঢিপি উঁচুতে কুড়ি ফুট অবধি হতে দেখা গেছে। আর দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ? একখানা পুরো গ্রাম একটা প্রাচীন উইঢিপির মালভূমির উপর দাঁড়িয়ে, এ দেখা গেছে।

গঠনের সৌন্দর্য ও বাহাদুরির কথা ভাবলে বলতে হয় যে উইপোকার বাসাগুলোকে আমাদের আর্কিটেক্ট ও ইঞ্জিনিয়ারদেরও আদর্শ বলা চলে। শুধু ঘর তৈরিরই আদর্শ নয়; টাউন প্ল্যানিং বা নগর পরিকল্পনারও আদর্শ বলা চলে। ঘরগুলোর বাইরে যাতায়াতের জন্য রাস্তা, বাতাস চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ, হাওয়া বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত, এমনকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকে। ঘরের বাইরের দেয়ালগুলো এমন শক্ত, যে ভাঙতে গাঁইতি বা শাবলের প্রয়োজন হয়। মাটির তৈরি হলেও জলে গলে যায় না, বা ভিতরে জল ঢোকে না। প্রাণিজগতে এই উইঢিপির কোন তুলনা আছে বলে জানা নেই। আবার সামরিক দিক থেকেও এগুলি আদর্শ দুর্গ। আর এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে, যে আধুনিক মিলিটারি আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কার যে মডেলে তৈরি হয়, উইঢিপি সেই মডেলেই তৈরি।

এ রকম সমাজ সংগঠন যাদের, তাদের উপর আশ্রয় করে যে কিছু প্রাণী হাজির হবে, এ তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে এক রকমের খুব খুদে খুদে পোকা, যাদের মাহুত পোকা বলে, তাদের কথা বলি। এরা উইপোকার পিঠের উপর কি ঘাড়ে বা মাথার উপর বসে থাকে, তাই ওদের এই নাম। এ পোকারা উইদের গায়ে যে ময়লা কি বীজাণু থাকে, তাই খায়। পিঁপড়েদের মত, খাবার নিয়ে যাবার সময় একটা উইপোকার মুখ থেকে, আর একটা উইপোকা

খাবার নেয়। ঠিক এই দেয়া নেয়ার সময়ে মাহুত পোকাও মুখের কাছে নেমে এসে, সেই খাবারের কিছু কিছু ভাগ নিয়ে যায়। মাহুতপোকার শরীর থেকেও আবার একরকমের মিষ্টি মিষ্টি রস বার হয়। উইপোকারা চেটে চেটে এই রস খায়।

কঙ্গোতে একরকমের মাছি দেখা যায়। এদের ডানা এত ছোট যে এরা উড়তে পারে না। এদের পেটগুলোও হয় চাউস। আর সেখানে অনেক রকমের মিষ্টি রসের গ্রন্থি থাকে। উইপোকারা এদের এনে নিজেদের বাসায় পোষে ও এদের খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে ও এদের শরীরের রস খায়। এই মাছিরা উইপোকাদের সঙ্গে না থাকলে বাঁচতেই পারে না। ঠিক এই ধরনের আর এক রকমের পোকা দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। এদের বলে রোভ বিট্‌ল। এদের শরীরটা দুদিক থেকে বড় বড় গ্রন্থিতে ভারী হয়ে একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। আর সেগুলো হচ্ছে শুধু উইপোকাদের খাওয়াবার জন্য। উইরা এদেরও পোষে। এইরকম সহাবস্থানের ফলে, বিবর্তনে প্রাণীদেহের কি ঘটতে পারে, এটা হল তারই উদাহরণ।

দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্ম অঞ্চলে একরকমের মৌমাছি আছে, যাদের হুল নেই। এরা উইঢিপিতে গর্ত করে চাক বানায়। হুল না থাকলেও এরা কামড়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কাজেই বলা যায়, এরা উইদের ঘরদোর রক্ষা করে ও তার বদলে আশ্রয় পায়। উইঢিবিতে অনেক বড় বড় প্রাণীও বাসা করে। যেমন টিয়ার ধরনের পাখী প্যারাকিটরা উইঢিপিতে বাসা করে।

এক একটা উইঢিপি কয়েকশো বছর পর্যন্ত থাকে। কাজেই এই দীর্ঘ-সময়ের মধ্যে কত শত প্রজন্ম যে হয়ে যায় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর মধ্যে আরো বহু প্রাণী, নানান রকমের সহ অবস্থানের ব্যবস্থা, পরস্পরের মধ্যে করে নিয়েছে। এইগুলি লক্ষ্য করলে আরও একটা জিনিস বোঝা যায়। বোঝা যায়, আমাদের যে ধারণা এক জাতের প্রাণী ও অন্য জাতের প্রাণীর মধ্যে শুধু বিরোধিতার সম্পর্ক, এটা একেবারে ভুল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত ভেবে এসেছে যে পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য। ভগবান নিজের ছাপেই স্ট্যাম্প মেরে, তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে বানিয়েছেন। মানুষ বড়জোর একটু দয়াদাক্ষিণ্য করে, অন্য প্রাণীদের নিজগুণে ভালবেসে পুষতে টুষতে পারে। কিন্তু প্রাণী বিজ্ঞানের একটু গভীরে গেলেই বোঝা যায় যে এ ধারণা ভুল।

আফ্রিকায় নাইল নদীর ধারে এক রকমের বড় জাতের টিকটিকি আছে।

বর্ষায় যখন উইঢিপি একটু নরম হয়, ও উইপোকারা যখন ওদের বাসার মেরামতের কাজে লাগে, তখনই এই মনিটাররা উইঢিপিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে। মেরামত হয়ে গেলে ওই ডিমগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ঘরে ফোটে। মানুষের তৈরি ইনকিউবেটারে ডিম ফোটানর মতন সুবিধাই মনিটাররা এখানে পায়।

উইপোকা কাঠ খায়, এটা আমরা জানি। কিন্তু উইপোকা কাঠ খেয়ে কি করে হজম করে, এটা আলোচনা করলে, সহ-অবস্থানের আর একটা দিকও পরিষ্কার হয়ে যায়। এ্যামিবা যে রকম এককোষী প্রাণী, ওইরকম একটিমাত্র কোষেই দেহ তৈরি, উইপোকাদের পেটে এইরকম একজাতের এককোষী প্রাণী বাস করে। এরাই একরকমের বিশেষ অনুঘটক বা এনজাইম তৈরি করে দেয়, যার সাহায্যে কাঠ ও সেলুলোজ উইপোকা হজম করতে পারে। কাঠকে হজম করে এই প্রাণীরা চিনিতে পরিণত করে দেয়, উইদের পেটের ভিতরে। উইরা তাইতে পুষ্ট। দীর্ঘদিনের সহ-অবস্থানের ফলে, আজ এমন হয়ে গেছে যে এই এককোষী প্রাণীরা পেটে না থাকলে উইপোকারা বাঁচতে পারে না, এটা বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। একটা উইপোকার কাছ থেকে, অন্য উইপোকা এই এককোষী প্রাণীদের পায়।

১৩

প্রাণীজগতের নাপিত ধোপা

যদিও মাসে একবার করে অন্ততঃ চুল ছাঁটতে যেতে হয়, মেয়েদেরও হেয়ার ড্রেসারের কাছে যেতে হয় প্রায়ই তবু আজকাল বোধহয়, নাপিতের পেশাটাকে আর সেই পুরানো মর্যাদা দেয়া হয় না। তখনকার দিনে, অন্ততঃ আমরা রূপকথার গল্পে শুনি; রাজা তাঁর প্রাণের, মনের কথা সব বলতেন নাপিতকে; নাপিত যখন তাঁর দাড়ি কামাচ্ছে, সেই সময়ে। চিকিৎসাক্ষেত্রে আজ যে সার্জারির উন্নতি আমরা লক্ষ্য করছি, এদের সুরু হয়েছে কিন্তু সেই বারবার সার্জেন বা নাপিত সার্জেনদের কল্যাণে। তা ছাড়া আমাদের দেশেও নাপিতরা যে ফোঁড়া কাটত, তাও কি আমরা ভুলে গেছি ?

প্রাণীদের মধ্যেও এমন এক এক জাতের প্রাণী আছে, যারা অন্য প্রাণীর নাপিত। মনে আছে তখন আমি ছোট। মাঠে অনেক গরু চরছে। তাদের মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটা বক দেখে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ বকগুলো ওখানে কি করছে ? বড়দের মধ্যেই কেউ উত্তর দিয়েছিলেন, যে ওরাই তো গরুদের নাপিত। যত পোকামাকড় গরুদের গায়ে বসে ওদের রক্ত চোষে, সব
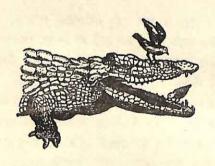
ওই বকেরা ওদের খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়। তা ছাড়া ওই বকেরা কানের খোল, কি শরীরের অন্য ময়লা তাও সাফ করে দেয়। নাক, কান, গলার ডাক্তারেরা বিশেষ গড়নের লম্বা মুখের, অথচ সরু চিমটের গড়নের গলা দেখার যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাইতে তাঁদের এ ধরনের কাজে সুবিধা হয়। বক ছাড়া

প্রায় শালিকের মত দেখতে এক রকম পাখী আছে, যারা গরুর গায়ে বসে ওদের নাপিতগিরি করে। তাই এদের নামও অক্সপেকার। নাম অক্সপেকার হলেও, বনের হরিণ বা অন্য প্রাণীদেরও প্রসাধন এরা কম করে না।

আমরা যখন ছোট, একটি বিশেষ টুথপেষ্ট, একটা চমৎকার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিত। ছবিটায় ছিল একটা কুমীর মস্তবড় হাঁ করে শুয়ে রয়েছে, আর দুটো ছোট ছোট পাখী। তার মধ্যে একটা পাখী কুমীরটার নাকের উপর বসে, আর একটা কুমীরের মুখের ভিতর ঢুকে ওর দাঁতগুলো যেন ঠোট দিয়ে সাফ করছে। কুমীরের হাঁয়ের ভিতর ঢুকলেও কুমীর ওকে কিছু বলছে না এটা আশ্চর্য লাগে। কিন্তু আশ্চর্য লাগলেও ব্যাপারটা সত্যি। এই পাখীর নাম হল প্লোভার। নাইল নদী অঞ্চলের কুমীরদের সঙ্গে প্লোভার পাখীর এই যোগাযোগ দেখা যায়। এ পাখীরা কুমীরের শরীরের পোকা, মাকড়, ময়লা এমনকি দাঁতের গোড়া থেকে পর্যন্ত ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। যে দেশে প্লোভার নেই, সে দেশে এই কাজ অন্য পাখীতে করে। তবে গা বা মাথার উপর বসে সে সব জায়গা পরিষ্কার করে দিলেও, প্লোভারের মত এ দেশে কোন পাখীকে কুমীরের মুখের মধ্যে ঢুকতে যদিও দেখি নি, তবু পিঠের পুরু চামড়ার খাঁজ থেকে ময়লা বা পোকা কোন কোন আমিষভোজী পাখীকে খেতে দেখেছেন আমার মত অনেকেই।

এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগে। কেনই বা কোন কোন প্রাণী, বেছে বেছে অন্য প্রাণীকে পরিষ্কার করার এই নাপিত-বৃত্তিটা নিলে ? এটা বুঝতে বেশী কষ্ট লাগে না। একটু বড় জাতের প্রাণীর শরীরে বিভিন্ন ধরনের ময়লা স্বাভাবিক কারণেই জন্মায়। এই ময়লায় অঙ্গার বা কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অনুরূপ অন্য রাসায়নিক বস্তু থাকে। এগুলি আবার বিভিন্ন বীজানু ও প্রাণীর খাদ্য। যাদের এগুলি খাদ্য, তারা এগুলি খাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়। আর বড় প্রাণীদেরও এগুলি দূর করাটা ভীষণ দরকার। কেন না এগুলি, বীজানু শুদ্ধ নিয়ে নিয়ে গায়ে থাকলে, বড়প্রাণীর গায়ে ক্ষত উৎপাদন করতে পারত। অথচ ছোট প্রাণীরা এদের দিব্যি খেয়ে হজম করে ফেলছে এদের, এমনকি জীবাণু পর্যন্ত।

এইখানেই প্রকৃতির সৌন্দর্য। একটা ভাল গল্পের যেমন একজায়গায় সুরু, যেতে যেতে একটা ক্লাইম্যাক্স বা চরমের মধ্যে দিয়ে, একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছয়। পরিণতিতে এলে গেলে মনে হয়, যেন চাকাটা ঘুরে যেখান

থেকে সুরু হয়েছিল, সেইখানেই যেন ফিরে এলো। প্রকৃতিতে ঠিক যেন এই রকম একটা রিসাইক্লিং বা পুনরাবর্ত্তন দেখা যায়। তাই জন্যই প্রকৃতির রাজ্যে কোন শেষ নেই। প্রকৃতি যেন চিরনূতন।

সে যুগে যখন জলপথে অনেক বিপদ ছিল, পালতোলা জাহাজডুবি হয়ে যেত, তখনই মানুষের হাঙরের ভয় ছিল খুব। তখনকার নাবিকরাই লক্ষ্য করেছিল, যে হাঙরের আগে আগে আসে বাঘের মত গায়ে সাদা কালো ডোরা, কিন্তু খুব ছোট ছোট এক জাতের মাছ। এদের নাম দেয়া হয় পাইলট ফিস। বাঘের আগে যেমন ফেউয়ের কথা শোনা যায়, হাঙরের আগে তেমনি দেখা যায় পাইলট ফিস।

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক সামান্য একটা পালতোলা নৌকা চড়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন। এই অভিযানে উদ্দেশ্য ছিল নৃ-তত্ত্ব সম্পর্কে। নৃ-তত্ত্ববিদ হায়ারডালের ধারণা ছিল যে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে যে প্রাচীন মানুষ বসবাস করে আসছে, সুদূরতম অতীতে তারা হয়ত নৌকা চেপে আমেরিকার মূল ভূখন্ড থেকে এই সব দ্বীপে এসেছে। এই থিয়োরির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য "কোনটিকি" অভিযান নাম দিয়ে এই অভিযানটি করা হয়।

কোনটিকির সঙ্গে একদল হাঙরও ওদের সঙ্গ নিলে। হয়ত তা ওদের ফেলে দেয়া খাবার দাবারের জন্যই। কোনটিকির অভিযাত্রীরা হাঙর সঙ্গে নিয়ে চলাটা মোটেই পছন্দ করলেন না। তাই তাঁরা হাঙরগুলো হার্পুন দিয়ে মারলেন। কিন্তু হাঙরের সঙ্গের পাইলট ফিসগুলো ওঁদের সঙ্গ ছাড়ল না। এ থেকে দেখা যায় যে ছোট মাছেরা একটা বড় কিছুর সঙ্গে সঙ্গে যায়। এমনি একসঙ্গে থাকাটা পছন্দ করে বলে, ছোট ও বাচ্চা মাছেরা এমন সুন্দর ঝাঁক বেঁধে চলা ফেরা করে যে মনে হয় যেন একদল সুশিক্ষিত সৈন্য যেন কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। অন্য প্রাণীর সঙ্গ ভাললাগা, এটা শুধু মানুষেরই স্বভাব নয়। দেখা গেছে বেরাল, পোষা খরগোস আর পোষা কাকে ভীষণ বন্ধুত্ব। কনরাড লরেন্স, যিনি প্রাণী-আচরণ বিদ্যায় বিশ্ববরেণ্য তাঁর ঘরেও কিছু কিছু প্রাণীর এরকম বন্ধুত্বের কথা তিনি লিখেছেন। আমাদের দেশে বিষ্ণুশর্মার গল্পে শুধু মিত্রলাভ নয়, মিত্র-ভেদের গল্পও কম নয়। অবশ্য আচরণ বিজ্ঞানে মিত্র-ভেদের খবর বড় একটা পাই না। এটা মানুষের ক্ষেত্রেই দেখি। তার কারণ মানুষের স্বার্থ ও স্বার্থপরতা বহুমুখী।

বাজপাখী যে কোন ছোট পাখী, এমনকি তাদের সমান আয়তনের পাখীও

ধরে খায়। কিন্তু তবু দেখা যায়, খুব ছোট ছোট পাখীরা, একই গাছে হয়ত ঠিক বাজপাখীর বাসার নিচেই বাসা করে। নাপিতবৃত্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছি, যে ছোট প্রাণীরা বড় প্রাণীর ফেলে দেবার জিনিস খায়। ওখানে যেমন খাবার কথা, এখানে ঠিক তার উল্টো; না খাওয়া।

ছোটপাখীরা বাজপাখীর বাসার তলায় বাসা করে, তার কারণ তারা জানে, যে বাসায় ডিম পেড়েছে, বাচ্চা হয়েছে, তার ধারে কাছে বাজ শিকার ধরবে না। শিকারের জায়গা তার অন্য। বরং বাজের বাসায় নিচে বাসা করায়, অন্য পাখী বা প্রাণী তাদের বাসায় আক্রমণ করতে ভয় পাবে। অর্থাৎ কি না বাজপাখীই বরং ছোট পাখী ও তার বাচ্চাদের বাঁচাবে। এ ধরনের সহ-অবস্থান অন্য ছোট বড় পাখীর মধ্যেও দেখা যায়। এর উদাহরণ হল, আফ্রিকার কাক জাতের ড্রঙ্গো (drongo), আর চড়াই জাতের অরিওলের বাসা করা।

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ত্যাগ করে, এ রকমের সহ-অবস্থান, উত্তর আমেরিকার আর দুটি প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। তা হল, প্রেইরি ডগ আর র‍্যাটল স্নেকের মধ্যে। প্রেইরি ডগ ভোঁদড় জাতের। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে এরা বাসা করে। আর র‍্যাট্‌ল স্নেক ভীষণ বিষাক্ত সাপ। শীতকালে এই সাপেরা, বাসা করে প্রেইরি ডগের বাসায়। প্রেইরি ডগের গায়ের তাপ ওদের শীত থেকে বাঁচায়; আর র‍্যাট্‌ল স্নেকের ভয়ে ওদের শত্রুরা কেউ ধারে কাছেও আসে না।

প্রাণীদের নাপিতগিরির কথায় অন্য কথা এসে গিয়েছিল। তাই আবার ফিরে আসি। চিড়িয়াখানায় গেলে, ছোট ছেলেদের অন্ততঃ ইচ্ছা হয় প্রথমে হিপোর ঘরে যেতে। চিড়িয়াখানার হিপোর গায়ে অবশ্য দেখা যায় না, কিন্তু আফ্রিকাতে যখন হিপোরা নদীর জল থেকে ওঠে, তখন ওদের গায়ে ওদের নাপিত লেগে রয়েছে দেখা যায়। হিপোর গা-গতর পরিষ্কার করার নাপিত হল, পোনা জাতের এক রকম মাছ। এরা এক ফিট, দেড় ফিট লম্বা হয়। এদের হাঁ বেশ বড়। আর এরা খেতে ভালবাসে হিপোর তেলা চামড়ায় যে মিউসিন বার হয়, তাই। আর এইভাবে গা পরিষ্কার করে দেয়াতে হিপোদেরও উপকার হয়। তা না হলে হিপোর গায়ে নানা বীজানু ও ফাংগাস হয়ে, যত পুরু চামড়াই হক, যখম করে দিত নানা রোগে।

তাই এই নাপিতদেরও হিপোরা ভালবাসে, ওদের কোন ক্ষতি করে না।

১৪

জিভ, নাক, চোখের বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সেই যে গানখানি,

> "কত বর্ণে কত গন্ধে
> কত গানে কত ছন্দে
> অরূপ তোমার রূপের লীলায়
> জাগে হৃদয়পুর।"

মনে আছে তো ? আমাদের সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এইগুলি দিয়েই অরূপের রূপ পর্যন্ত আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে। আমাদের এগুলি যে রকম, অন্য প্রাণীদের এই বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক এক রকম নয়। যেমন ভাল ভাল খাবারের স্বাদ আমরা নিই জিভ দিয়ে। অবশ্য মুখেও স্বাদের বোধ হয় অনেকটা পাই, আর গন্ধেতেও। যাই হক, আমাদের কাছে স্বাদের সবটাই মুখের কাছে। কিন্তু মাছি বা প্রজাপতির ? একেবারে অন্য জায়গায়।

তা হলে কি এদের জিভ থাকে না ? অবশ্যই থাকে। ফুলের উপর বসে প্রজাপতিকে তার লম্বা জিভ বার করতে, কি মাছিকে জিভ বার করে খাবার চাখতে কেবা দেখেনি ? কিন্তু তবু জিভের তুলনায় এদের পায়ে স্বাদের বোধটা পাঁচগুণ বেশী। তাইতো মাছিকে খাবারের উপর বার বার বসে পা চালিয়ে দেখতে হয় খাবারটা কি রকম, এ জন্য আমরা যত বিরক্তই হই না কেন। আবার এই জন্যই ফুলে ফুলে প্রজাপতিকে বসে পা দিয়ে দেখতে হয় কোন ফুলের মধু কি রকম।

মাছি কি প্রজাপতির এই বোধ আবার বাড়ে কমে। যেমন দশ দিন উপোস করিয়ে রেখে দেখা গেছে, মাছির পায়ের স্বাদের বোধ, জিভের তুলনায় সাতশো গুণ বেড়ে যায়। উপোস করিয়ে রাখলে, প্রজাপতি চিনির রসে, আমরা যাতে স্বাদ কি মিষ্টতা বুঝতে পারব না, ওরা তার পাঁচশো গুণ বেশী

পারে। কাজেই রসের কথা আমরা যতই বলি, পরীক্ষা করেই দেখা গেছে, মৌমাছি-মাছি-প্রজাপতিদের স্বাদ বোঝার ক্ষমতা রসবোধ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

ওদের পায়ে কি এমন আছে, যা দিয়ে ওদের আস্বাদ আসে? এর মধ্যেও খুব একটা জটিলতা নেই। একটু লক্ষ্য করলে, কি লেন্স দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে প্রতিটি লোমের ভিতর দিয়ে একটি স্নায়ুতন্ত্র গেছে। এই তন্ত্রের শিকড়ের কাছে তিনটি স্নায়ুকোষ। এর মধ্যে দুটি হল স্বাদের, একটি স্পর্শের।

প্রজাপতি শুধু যে মধুরই ভক্ত, তা নয়। প্রজাপতি গায়েও খুবই বসে; আর আমাদের দেশে বলে তার মানে হল যে বিয়ের ফুল ফুটেছে। ফুল ফুটুক না ফুটুক বিয়ের, আমাদের দেশে, গরমের জন্য প্রজাপতিদেরও নোনতা খাবারের দরকার হয়, তাই এরা গায়ে বসে নোনতা ঘাম জিভ দিয়ে খায়।

মৌমাছিদের মধু আনার জন্য অবশ্যই চিনি বা শর্করাজাতের যে রাসায়নিক বস্তু আছে তাই বিভিন্ন ফুল থেকে সংগ্রহ করে। তারপর তার মধ্যে সামান্য রাসায়নিক পরিবর্তন করে তাকে পরিণত করে মধুতে। রাসায়নিক দিক থেকে চৌত্রিশটি শর্করা আছে। এর কোন না কোনটি, এক একটি বীজানু খায়। এর মধ্যে মৌমাছি মাত্র নটি ব্যবহার করে। মানুষের কাছে এগুলির ব্যবহার অন্য কাজে এর মধ্যে তিরিশটি মানুষেরও মিষ্টি লাগে।

মৌমাছিদের আর একটি অভ্যাসের কথা বলি। মধু সংগ্রহ করে, এক মৌমাছির মুখ থেকে আর এক মৌমাছি একটু খায়। তাই এক এক চাকের মৌমাছির এক এক রকম গন্ধ। অন্য চাকের কোন মৌমাছি এলে, ওরা ঠিক বুঝতে পারে, আর তাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ে।

মাছেরা স্বাদ নেয়, ওদের সাঁতার কাটার পাখনা দিয়ে। এ্যাকেয়ারিয়ামে খাবার দিয়ে তাই দেখা যায়, মাছেরা তার কাছে এসে জোরে জোরে ডানা নাড়ছে। অবশ্য সেই সঙ্গে মুখ আর কানকো দুটোই চালায়, এই ভাবে খাদ্য-অখাদ্য দেখে নিয়ে তবেই ওরা খায়।

স্বাদের কথা তো কিছু কিছু হল, এবার গন্ধের কথায় আসি। মানুষের কাছে গন্ধটা একটা খুব বড় জিনিস; তবু অন্য অনেক প্রাণীর তুলনায় তা

কিছুই নয়। যেমন যদি কুকুরের কথা ধরা যায়, তা হলে বলতে হয়, মানুষের গন্ধের অনুভূতি তার তুলনায় নগণ্য। একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলে সুরু করি।

কলকাতার ময়দানের সেই অনুষ্ঠানে কত হাজার লোক ছিল তা বলা শক্ত। পাঁচ, সাত, দশ হাজার হয়ত হবে। সেই মেলায় পুলিশের কুকুরের গন্ধ শুঁকে অপরাধীকে চেনার ক্ষমতা দেখানো হচ্ছিল। আমার রুমালটা পুলিশের একটি কুকুরকে শুঁকতে দেয়া হল। তার পর অত হাজার লোকের মধ্যে থেকে কুকুরটি ঠিক আমার কাছে চলে এলো। এই যে এত হাজার হাজার লোকের মাঝখান থেকে, যেখানে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, সেই সহস্র গন্ধের ভীড়ের মধ্যে, আমাকে কি করে বেছে নিতে পারল ? এ রহস্যের চাবিকাঠি কিন্তু কুকুরের ঘ্রাণযন্ত্রের গঠনে।

আমাদের নাকের ভিতরে গন্ধ নেবার জন্য একটি পর্দা আছে। এ পর্দাটির আয়তন একটি ছোট ডাক টিকিটের সাইজের। আর সেই জায়গায় একটা মাঝারি সাইজের কুকুরের নাকে গন্ধ নেবার যে পর্দা, তাকে সোজা করে মেলে ধরলে, তার সাইজ পঞ্চাশটি ষ্ট্যাম্পের সমান আয়তনের হবে। গন্ধ নেবার কোষ, যে জায়গায় মানুষের নাকে পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি, কুকুরের নাকে তা বাইশ কোটি। আবার এই কোষের প্রতিটি কাজ করে আমাদের চেয়ে ভাল করে। এরই ফলে আমাদের চেয়ে কুকুরের গন্ধ নেবার ও বোঝবার ক্ষমতা কয়েক লক্ষ গুণ বেশী।

আমরা যখন হেঁটে চলি, পায়ে যত ভাল জুতোই থাক না কেন, তার ভিতর দিয়ে, একগ্রামের এক লক্ষ ভাগের একভাগ, এই রকম পরিমাণের গায়ের গন্ধ ঘামের সঙ্গে মাটিতে মিশছে। এই গন্ধ পায়ে চলার পথে পাওয়া যায়। কুকুর সেই গন্ধের রেখা ধরে মানুষকে খুঁজে বার করে। শুধু ঘাম কেন, পাইখানা প্রস্রাব সব কিছুতেই প্রাণীটির গায়ের নিজস্ব গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা যেমন মুখ চিনি, হাতের লেখা চিনি কুকুর, হাতী ও অন্য বহু প্রাণীর পক্ষে তেমনি গন্ধ চেনা সম্ভব হয়।

সাদা মথ প্রজাপতির গন্ধ নেবার ইন্দ্রিয় হল ওর সরু সরু লোমওয়ালা শুঁড়। পুরুষ-মথ স্ত্রী-মথের গন্ধ এক মিলিগ্রামের দশহাজার ভাগের কম।

পরিমাণ দ্রব্য থেকেও পায়। মানুষের কাছে এ এক অসম্ভব ব্যাপার। অনুর হিসাবে, মাত্র শ'খানেক অনু থেকেই মথ গন্ধ পাবে।

গন্ধটা কি ? গন্ধ হল, গন্ধ দিতে পারে, এমন অনুর কাঁপন। অনুটা কাঁপতে হলে, তার ভিতরের পরমাণুগুলো কাঁপা চাই। নাক, কি যে ইন্দ্রিয়
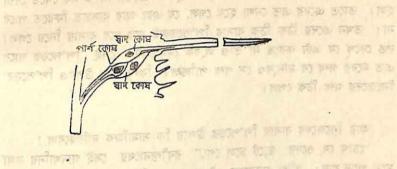
গন্ধ নেবে, তাতে খোলা অবস্থায় ভাইটামিন 'এ' ও প্রোটিনের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ক্যারটিন থাকে। গন্ধের যে অণু, তাদের কাঁপন থেকে, ক্যারটিন ও ভাইটামিন 'এ' শক্তি পায়। এই শক্তিই মস্তিষ্কে গন্ধের সাড়া জাগায়। বিশেষ বিশেষ চাবিতে যেমন বিশেষ তালা খোলে, তেমনি বিশেষ গড়নের অণু বিশেষ অনুভূতির তালাটা খুললে, আমরা বিশেষ গন্ধটি পাই।

গন্ধের জগৎটা পাখীদের অন্য অনেক প্রাণীর তুলনায় ছোট। গন্ধের রাজ্যটা ছোট হয়ে, এদের দেখার যে দৃশ্যজগৎ, সেটাই খুলে গিয়েছে। এটা দেখা যায় হাঙ্গরের মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনা করলে। হাঙ্গরকে প্রধানতঃ গন্ধের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। তাই তাদের গন্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট লোবটা তুলনামূলক ভাবে পাখীদের চেয়ে অনেক বড়। পাখীদের তেমনি দৃষ্টির লোবটি অনেক বড়।

পিঁপড়েদেরও জীবনে গন্ধটা খুব বড়। তারা যে সার বেঁধে একটা লাইন ধরে যাতায়াত করে, এটা তারা করতে পারে গন্ধের সাহায্যে। আমি নিজে একটি ছোট পরীক্ষা করে দেখেছি। পিঁপড়েরা যে লাইন ধরে যাচ্ছে, সেই লাইনের উপর আঙ্গুল ঘসে দিলে, এই আঙ্গুলের গন্ধে কিছুক্ষণের জন্য পিঁপড়েরা বিভ্রান্ত হয়ে এলোমেলো যাতায়াত করে। কিন্তু একটু পরেই

মানুষের গন্ধটা মিলিয়ে আসতেই, আবার নিজেদের গন্ধ পেয়ে ঠিক লাইন ধরে চলতে সুরু করে দিলে।

পিঁপড়ে নিয়ে লর্ড লুবকের একটি পরীক্ষার কথা বলি। এক বাসায় থাকে এ রকম পিঁপড়েরা পরস্পরের মুখের জিনিস খায় বলে, তাদের একই গন্ধ। লর্ড লুবক এই রকম দুটি বাসার পিঁপড়েদের দু' রকম রং করে দিলেন। তারপর দু' রংয়ের কিছু কিছু পিঁপড়েকে মিষ্টি মদ খেতে দেয়া হল। তাতে এদের এত নেশা হয়ে গেল, যে এরা আর বাসাতে ফিরতে পারে না। তখন এদের ঠিক ঠিক বাসার পিঁপড়েরাই ধরে ধরে বাসায় নিয়ে গেল। রঙ দেখে যে এটা করছে না তাও লুবক দেখালেন। সেই পিঁপড়ের গায়ে এত মদের গন্ধ যে মানুষও সে গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু তার উপরও পিঁপড়েরা নিজেদের গন্ধ ঠিক পেল।

আর নিজেদের বাসার পিঁপড়ের উপরে কি সামাজিক দায়িত্ববোধ !

"চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো," রবীন্দ্রনাথের সেই গানখানির কথা মনে পড়ে যায়। সত্যি আমাদের ওই যে চোখ দুটি দূর থেকে দূরে শুধু কি ছুটেই চলেছে ? দূরের যা, তারই বার্তা বহন করে নিয়েও আসছে। কিন্তু আমাদের চোখ বাজপাখী কি ঈগলের চোখের কাছে তো কিছুই নয়। ক্যামেরায় টেলিফটো লেন্স থাকলে যেমন দূরের জিনিস অনেক বড়ো দেখায়, ওদের চোখের লেন্সটা ঠিক ওই রকমের। আর লেন্সের ফোকাস করার ক্ষমতা আমাদের চোখের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যখন কেউ খাবার দোকানে কোন খাবার কিনলে, চিল অন্ততঃ আধমাইল দূর থেকে তা দেখে। আমরা দেখলে, মানুষটাকেই এত ছোট দেখতাম, যে তার হাতে খাবারের ঠোঙাটা দেখতেই পেতাম না। কিন্তু চিল ? তার চোখের লেন্স, টেলিফটো লেন্স। সে শুধু কি ঠোঙাটা ? খাবার-গুলোও দেখে যেন দু মিটার দূর থেকে দেখছে। আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ছোঁ মারে।

আর ফড়িংয়ের চোখ ? ওদের চোখ হল যাকে বলে পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)। এতে স্বচ্ছ ঝাড়ের কাঁচের মত জিনিস থাকে যাকে বলে ওমাটিডিয়া। একটি ফড়িংয়ের চোখে এরকম আটাশ হাজার ঝাড়ের কাঁচ থাকে। এ চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন জীববিজ্ঞানী বলেছেন, এ যেন শার্সিতে কাঁচের বদলে কাটা হীরে লাগানো। তাই দশ পনেরো

মিটার দূরে কোন কিছু গেলে, ছায়া ওদের চোখে পড়ে। এতে ওদের আত্মরক্ষার কতটা সুবিধা হয় তা বোঝা যায়।

বিবর্তনে, কোন প্রাণীর কোন ইন্দ্রিয়ের কতটা উন্নতি হবে তা তার বাঁচার তাগিদেই হয়েছে। আর তার পূর্ণতম সুযোগ প্রকৃতি দিয়েছে। সেদিকে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়, আর যে আত্মপ্রসাদ মানুষের যে মানুষই সৃষ্টির মধ্যমণি সেটাও দূর হয়।

১৫

মৌমাছিদের ভাষা

১৯৪৬ সালে সারা বিশ্ব আশ্চর্য হয়ে একটি নাটকীয় আবিষ্কারের কথা শুনল। এটি কার্ল ফন ফ্রিৎসের মৌমাছিদের ভাষা সম্পর্কিত আবিষ্কার। পরবর্তীকালে কনরাড লরেন্স ও নিকো টিম্বারজেনের সঙ্গে ফ্রিৎসকেও নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু নোবেল পুরস্কার দেয়াটা বড় কথা নয়, মৌমাছির ভাষা সম্পর্কে ফ্রিৎসের আবিষ্কারের কথা সকলের জানা দরকার।

বহুদিন ধরেই ফ্রিৎস লক্ষ্য করেন যে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করছে, তারা চাকে ফিরে দু'রকমের নাচ নাচে। এর একটির তিনি নাম দেন, গোল নাচ আর একটির নাম দেন, ল্যাজ নাড়া নাচ। তাঁর এটাও মনে হয়েছিল, যা তিনি পরে প্রমাণ করেন যে, গোল নাচের বক্তব্য হল যে সেই নাচিয়ে যে মধুর সন্ধান পেয়েছে, এটা অন্য মৌমাছিদের জানানো। আর ল্যাজ নাড়া নাচের সাহায্যে সে অন্য মৌমাছিকে দেখিয়ে দেয়, কোথায় মধুর সন্ধান করতে হবে।

ক্রমশঃ আরো বোঝা যায়, যে গোল নাচ এটাও দেখিয়ে দেয়, যে মধুটা অল্পই দূরে অর্থাৎ চল্লিশ পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে। আর ল্যাজনাড়া নাচে বোঝানো যায়, যে মধু অনেক দূরে, অর্থাৎ একশো মিটার কি তারও বেশী। এর মাঝামাঝি দূরত্বটা বোঝাতে, এই দুরকম নাচের মাঝামাঝি নাচ; আর সেটাও দূরত্ব অনুযায়ী।

গোল নাচে এক জায়গা থেকে ফিরে প্রথমে একদিকে ও পরে আবার অন্যদিকে নাচে। আর সেই জায়গায় ল্যাজনাড়া নাচে, বাংলা চার বা ইংরাজি আটের মতন ভঙ্গীতে, প্রথম আধখানা ডানদিকে ও পরের আর্ধেকটা বাঁ দিকে করে। আর সেই সঙ্গে ল্যাজ ও কোমরটাকেও ডানদিকে ও বাঁ দিকে হেলাতে থাকে।

ফ্রিৎসের এইগুলি বোঝা সম্ভব হয়েছিল, মৌমাছি নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা। তিনি মৌচাকের কাছে একটি চিনির রসের পাত্র রাখলেন। একটু একটু করে তিনি রসের পাত্রটিকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগলেন। এমনি ভাবে, তিনি এই দূরত্বটাকে ১·৩৫ কিলোমিটার নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন যে দূরত্বটা তিনি যত বাড়িয়ে যেতে লাগলেন, ততই মৌমাছি, যে খবর দিতে আসছে, সে ততটা আস্তে আস্তে কোমর দোলাতে লাগল।
যে খবর দিতে আসছে, সে ততটা আস্তে আস্তে কোমর দোলাতে লাগল।
এই প্রকাশভঙ্গী বার বার লক্ষ্য করে, তিনি বুঝলেন যে মধু কতটা দূরে, এটা মৌমাছিরা পরস্পরকে ভালবাবেই জানাতে পারে।

কিন্তু শুধু কতটা দূরে মধু আছে, এ টুকু বললেই তো আর হয়ে গেল না। কোন দিকে যেতে হবে, এটাও বলে দিতে হবে। "কুমারের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে" এ রকম বর্ণনা মানুষ বুঝতে পারলেও, মৌমাছি তো আর এ ধরনের কথা বুঝবে না। তার কাছে একমাত্র চেনা জিনিস হল সূর্য। যদি চাকটি সোজা একটি জ্যামিতিক লম্বের মত হয়, আর যদি ইংরাজি আট অক্ষর তৈরি করার সময় মৌমাছি আটের পেটটা তৈরি করতে একেবারে সোজা কোমর না বেঁকিয়ে নামিয়ে আনে, তা হলে বুঝতে হবে যে দিকে সূর্য, চিনির রস সেই দিকের উল্টো দিকে। আর যদি উপর দিকে উঠে যায়, তার মানে হল রসটা সূর্যের দিকে।

সূর্য যেমন যেমন সরে যেতে থাকে, মৌমাছিরাও সেই অনুযায়ী ডান দিকে বা বাঁ দিকে বেশী বা কম কোমর হেলিয়ে, সূর্যের থেকে রসের জায়গাটা ঠিক কোন দিকে তা নির্ভুলভাবে অন্য মৌমাছিদের বুঝিয়ে দেয়। এটা কত ভাল ভাবে ওরা করতে পারে, সেটা ফ্রিৎসের একজন ছাত্র লক্ষ্য করেছিলেন। ইনি চুরাশি মিনিট ধরে মৌমাছির যাওয়া আসা ও নাচ লক্ষ্য করেছিলেন। এর মধ্যে সূর্য চৌত্রিশ ডিগ্রি সরে গেছে। দেখা গেল নাচের বিশেষ কোণটিও এই সময়ে ওরা তেত্রিশ ডিগ্রি ঘুরিয়েছে। এ থেকেই দেখা যাবে কত নির্ভুল বার্তা ওরা দিতে পারে। বার্তাটা পাবার জন্য অন্য মৌমাছি বার্তাবাহকের গায়ে গা ও শুঁড়ে শুঁড়ে ঠেকিয়ে রাখে। শুধু চোখে দেখে নয়, এমনি বিবিধ উপায়ে ওরা বার্তা নিয়ে থাকে।

আকাশ যদি মেঘে ঢাকা হয়, তবু ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এর কারণটা একটু বলি। কোন কিছু থেকে আলো যখন বার হয়, তখন তার তরঙ্গের কাঁপন সব দিকে থাকে। কিন্তু সে আলো যদি কোন পোলারয়েড

পদার্থের মধ্যে দিয়ে আসে, তখন শুধু একদিকের কাঁপনজাত তরঙ্গই বার হয়ে আসে। এ ধরনের আলোয় মানুষ কমই দেখে, কিন্তু মৌমাছিদের মত প্রাণীরা ভালই দেখে। তাই মেঘঢাকা আকাশে, সূর্যের অবস্থান আমরা না দেখতে পেলেও মৌমাছিরা দেখতে পায়। তাই মেঘঢাকা থাকলেও সূর্যের অবস্থান বুঝতে ওদের অসুবিধা নেই।

এ ছাড়াও ফ্রিৎসের আরো কয়েকটি আবিষ্কারের কথা বলা উচিত।
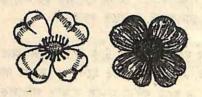
মৌমাছিরা যে মধু আনতে যায়, তার পর তারা আবার ফিরে আসে কি করে ?
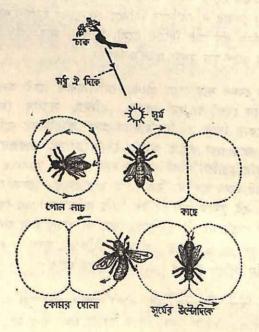
এখানেও ফ্রিৎস দেখালেন, যে পথ দিয়ে ওরা যায়, সূর্য ও কোন দিকে

ওরা ঘুরল ফিরল, এটা ওদের স্নায়ুর মধ্যে ছাপের মতন থেকে যায়। তাতেই ওরা ফিরতে পারে। এলোমেলো ঘোরালে ওরা বিভ্রান্ত হতে পারে। এ রকমের বিভ্রান্ত মৌমাছি অনেক সময় ঘরের ভিতর এসে হাজির হয়। কখনো বিভ্রান্ত মৌমাছি অন্য মৌচাকে হাজির হয়। এ হলে ওদের গন্ধ পেয়ে, সেই চাকের মৌমাছিরা ওকে তাড়িয়ে দেয়। এক চাকের মৌমাছিরা একজন অন্যের মুখ থেকে খায় বলে ওদের একই গন্ধ। তাই অন্যদের খুব সহজেই "বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে পারে।"

আমাদের কাছে ফুলের রঙ, বা তার মধুর ভাঁড়ার যে রকম দেখতে, মৌমাছির কাছে তা নয়। কারণ ফ্রিৎসই দেখান যে এরা বেগুনী পারের আলো দেখতে পায়। ধরা যাক পোটেনটিলা ফুল। আমরা এ ফুলের যেখানে মধু আছে সে জায়গাটা দেখব যে আয়তনের, এই ফুল বেগুনী পারের আলো দেয় বলে মৌমাছির কাছে এ জায়গাটা তার চেয়ে আটগুণ বড় দেখাবে। কাজেই তাদের এতে সুবিধা বেশী হবে।

মৌমাছি কি ভাবে চলাচল করে, তার আলোচনা করলাম। কিন্তু ঠিক ওইরকম আশ্চর্য লাগে যাযাবর পাখীদের সারা বিশ্ব জুড়ে যাতায়াতে। ওরা রাতে যাতায়াত কি করে করে ?

প্ল্যানেটেরিয়ামে একরকম পাখী ওয়াবলার রেখে দেখা গেল যে প্ল্যানেটেরিয়ামে কৃত্রিম আকাশের তারা দেখে ওরা যে রকম সুইডেন থেকে ইতালির কাছ দিয়ে আফ্রিকার মিশরে যায়; প্লানেটেরিয়ামে যাত্রাপথ খুব কম হলেও ওরা এই পথ অনুসরণ করল।

হাজার হাজার বছর ধরে এই সব প্রাণী, পরস্পরের কাছে কি ভাবে একটি কি দুটি বার্তা দেবে; কিম্বা কি ভাবে, তারা দেখে যাতায়াত করবে, এ সব গুণ তারা এঁইভাবে দীর্ঘ বিবর্তনে পেয়েছে। এর সবটা যে আমরা আজো বুঝি বা জানি, তা নয়। কিন্তু ফ্রিৎস, টিম্বারজেন কি পাখীর উপরে প্ল্যানেটেরিয়ামে ১৯৬০ সালে সয়ের যে কাজ করেছেন, এমনি ধৈর্য, ও পরিশ্রমের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা করলে বহু অজানাই হয়ে উঠবে জানা।

১৬

মানুষের উপর একটি পরীক্ষা

নাক থ্যাবড়া, গায়ে বড় বড় লোম, চোখগুলো গোল গোল, এইরকম কুকুরই লোকে বেশী পছন্দ করে। কথাটা সত্যি কি ? এই কথাটার সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য টিম্বারজেন একটি পরীক্ষার কথা বলেছেন। এটি ১৯৪৩ সালে করা পরীক্ষা কনরাড লরেন্সের।

পরীক্ষাটির কথা প্রথমে বলি। লরেন্সের ধারণা হল, আমরা যে পশু, পাখী এসব পুষি, এর পিছনে থাকে কিন্তু সন্তানস্নেহ। যে কোন প্রাণীর প্রজাতি রক্ষা করার জন্য চাই সন্তানস্নেহ। মানুষের এই স্নেহটা খুবই বেশী। তাই মানুষের ক্ষেত্রে শুধু মানবশিশু নয়; কুকুর, খরগোস কি পাখী, সব প্রাণীদের বাচ্চার উপরেও মানুষের ভালবাসা।

এটা পরীক্ষার মডেল হিসাবে তিনি কয়েকটি পুতুল তৈরি করালেন। পাশাপাশি বড় মানুষ আর মানবশিশুর মুখ; খরগোস, কুকুর আর পাখীর, বড় আর শিশুর মুখ তৈরি করা হল। দেখা গেল শিশু মুখগুলো সবই একটু গোল। এদের নাকটা খাঁদা, চোখ গোল, মুখের লম্বাটা কম, যে রকম হয় আর কি। যাই হোক এই পুতুল গুলো, মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন মানুষকে দেখান হল। দেখা গেল বেশীর ভাগই লোকই শিশু প্রাণীদের বেছে নিলে।

খুব অল্প সংখ্যক (জন আষ্টেক দশেক হবে) স্ত্রী, পুরুষ, এমনকি ছোট ছেলেমেয়েদেরও এখানে আমি এই মডেলের ছবি দিয়েছিলুম। দশ জনের মধ্যে আটজনই শিশু প্রাণীদের পছন্দ করল। লরেন্সের থিয়োরি এখানে পর্যন্ত যাচাই করা সম্ভব হল। কিন্তু এ থেকে একটা জিনিস বার হয়ে আসে। এটা কুকুরের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। কারণ তথাকথিত পেট্ হিসাবে কুকুরই সব চেয়ে জনপ্রিয়। কুকুরের চেহারা, বিশেষ করে ছোট, নাক থ্যাবড়া ও বড় বড় লোম তৈরি করার দিকে এত রকমের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এ সবকিছুর মূলে কিন্তু একটি কথা—একটা খেলনা তৈরি করা।

শুধু ছোট সাইজের হলেই কিন্তু আদর্শ খেলনা হয়ে ওঠে না। তা হলে তো চি-হুয়া-হুয়া সব চেয়ে জনপ্রিয় কুকুর হত। চি-হুয়া-হুয়া কুকুর কি
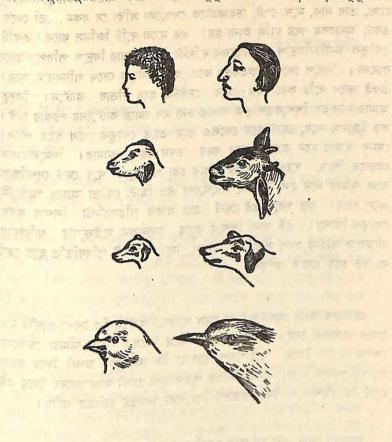
রকম তাই বলি। আমেরিকার কুকুর এরা। এত ছোট কুকুর সারা পৃথিবীতে আর নেই। লম্বা ও উঁচুতে এরা মাত্র ইঞ্চি ছয়েক হয়। কিন্তু এদের মুখ, পা, বুক, পেট এ গুলির সামঞ্জস্য বা প্রপোরশান সাধারণ কুকুরের মতন। এত ছোট হলেও এ কুকুরের মুখ বাচ্চা কুকুরের মতন নয়। তাই হয়ত এ জাতের কুকুর যতটা জনপ্রিয় হতে পারত, ততটা যেন নয়।

ছোট ছেলেদের খেলনা যখন তৈরি করা হয়, তখন কুকুর, বেরাল, হাঁস কি মানুষ যাই বানানো হোক, তাকে কার্টুনের মডেলে তৈরি করা হয়। এ থেকে কার্টুন ও কার্টুনের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আসে। কার্টুন বলতে আমরা

কি বুঝি ? কার্টুন আমাদের হাসির উদ্রেক করে। যাকে কার্টুনে আঁকা হচ্ছে, তার নাক, মুখ, পেট, চেহারাটাকে সেগুলো সত্যি যে রকম, তা থেকে একটু অন্যরকম করে হাসি আনা হয়। এর মূলে দুটি জিনিস থাকে। একটি কৌতুক অন্যটি বিদ্রূপ। কৌতুকের দৃষ্টিটা শিশুর আর বিদ্রূপ পরিপূর্ণভাবে বড়দের। বিদ্রূপ দেখে বিকৃতকরণ করে, আর কৌতুক দেখে পরিবর্তন করে। একই ভাবে দুটি করা হয়; আর সেইটাই হয়ে দাঁড়ায় কার্টুন। কিন্তু আমার মনে হয় শিশুর কৌতুক পাবার জন্য সব সময়ে কার্টুনের দরকার নেই। বড় জিনিস শুধু ছোট হয়ে গেলেও তার তাতে কৌতুক বোধ হতে পারে। যেমন আমার মনে আছে, সাত বছর তখন বয়স আমার। শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে, দূরে পাহাড়ের উপরে চরা গরুগুলো খুব ছোট দেখাচ্ছিল বলে আমার মনে হল, যে ওই গরুগুলো এত ছোট, যে তা আমার পকেটেই এসে যাবে। বড় গরুর এই ছোট হয়ে যাবার পরিবর্তনটা শিশুর কাছে কৌতুক-বিশেষ। এই জন্য শিশুর কাছে জোনাথন সুইফ্‌টের গালিভার ট্রাভল্‌স বইটার গল্প সামাজিক বিদ্রূপ নয়। তা এই পরিবর্তিত হয়ে ছোট বা বড় হয়ে যাবার কৌতুক।

ছোটদের কাছে খেলনার মুখ চোখ গুলো, কার্টুন কি শিশু প্রাণীর মত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বড়দের কাছে আছে। তাই আমরা ছোটদের খেলনা করতে গিয়ে, তার শিশু চেহারা কি কার্টুনের ভঙ্গী দিয়ে তাকে বড়দের খেলনা করি। আর জনপ্রিয় গৃহপালিত প্রাণী যারা তাদের উপর এই দুটি ডিসটরশান বা বিকৃতকরণের বিরূপতা নিয়তই চাপিয়ে যাচ্ছি।

কুকুরের উপর এটা সব চেয়ে বেশী করা হয়েছে, তারপর বেরাল ও ঘোড়া। কুকুরের উপর যে সব চেয়ে বেশী করা হয়েছে বা করতে পারা গেছে, তার কারণ পুরুষানুক্রমে কুকুর মানুষের হাতে সব চেয়ে বেশী আত্মসমর্পন করেছে। কুকুরকে মানুষ করেছে তার জীবন্ত খেলনা, সেই সঙ্গে বিশ্বস্ত বন্ধু, শিকারে সহযোগী, ঘরের প্রহরী, একাকিত্বের সহচর, অন্ধের চালক; শান্তিরক্ষায় সাহায্যকারী, আরো কত কি। প্রাণীদের আচরণতত্ত্বের জগৎ তাত্ত্বিক, ডাঃ কনরাড লরেন্সের একখানি বিখ্যাত বই আছে **"Man Mects Dog"** পোষ মানবার কথা ছিল না যে নেকড়ের কাছাকাছি জাতের প্রাণীর, তারা কি করে মানুষের পরম বন্ধু হয়ে উঠল, তারই গল্প। এটা সে গল্পের জায়গা নয়, তবু ওই বইটির কথা না বলে পারলাম না।

১৭

কাঠবেরালী

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "দিদির কাঠবেরালীটা ভাল আছে তো ?" পোষা ওই কাঠবেরালীটাকে আমারও একদিন দেখে আসার ইচ্ছা ছিল। এত শুনেছি ওর কথা।

কিন্তু যাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, "না ওটা মরে গেছে।" সত্যি একটা দেখবার জিনিস দেখা হল না।

আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁর দিদির এই কাঠবেরালীটা। কাঠবেরালী পোষা বড় একটা দেখা যায় না। এত ভীতু ওরা। সামান্য একটু শব্দ, কি কোন একটা কিছু এগিয়ে আসছে দেখলে, ওমনিই ছুট। আর সেও কি রকমের ছুট; যে একবার দেখেছে, সে আর ভুলতে পারবে না। বড় বড় লোমওয়ালা ল্যাজটা পিঠের উপর তুলে এক ছুটে গাছের মগডালে, কি একেবারে চোখের আড়ালে।

দেখাটা এমনি লুকোচুরির; তবু কিন্তু আমাদের ঘরের আশপাশে যত প্রাণী দেখি, তার মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে সুন্দর দেখতে এই কাঠবেরালী। গাটা সাদা। পিঠে আছে তিনটি কালো কালো ডোরা। এ ডোরা কেন, তারও এক কিংবদন্তি আছে। লোকে বলে, রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের জন্য সেতু বন্ধনে ব্যস্ত, তখন দেখলেন সমুদ্রের জল ছেঁচতে সাহায্য করছে কাঠ-বেরালী। রামচন্দ্র তা দেখে এত খুসী হয়েছিলেন, যে তিনি নাকি কাঠ-বেরালীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুল তিনটির দাগই নাকি রয়ে গেছে কাঠবেরালীর পিঠে।

আমাদের এখানের কাঠবেরালীর পিঠে ডোরা থাকলেও, ইউরোপ আমেরিকায় তা নেই। কেউ হয়ত বলবেন, ও দেশে তো রামও ছিলেন না, আর সীতা উদ্ধারের ব্যাপারটাও ঘটে নি।

কাঠবেরালীর দাঁতের ধারও সাংঘাতিক। একবার কামড়ালে রক্তারক্তি। তাই জন্য বিশেষ কেউ পোষার কথা ভাবে না। তবু কি করে এই কাঠবেরালীটা আমার বন্ধুর দিদির পোষা হয়ে গেল, সেই কথাটাই বলি।

দিদি একা থাকতেন। বাদাম, পেস্তা থেকে সুরু করে, আমসত্ত্ব, আচার, নানান রকমের খাবার দাবার আমাদের মতন অন্য পাঁচজনকে দিতে হবে বলে, সর্বদাই তিনি তৈরি করতেন। কাঠবেরালীটা ক্রমশঃ দেখল, দিদির কাছে রকমারি খাবার দাবার। প্রথমটায় দূরে দূরেই থাকত। তার পর ক্রমশঃ দেখলে, যে দিদি মানুষটা তো ভাল। কোন ক্ষতি করা তো দূরের কথা, একটু তাড়া পর্যন্ত দিদি দেন না। বরং কাছে এলে খাবারদাবারই দেন।

এমনি করেই কাঠবেরালীটার ভয় ভাঙতে লাগল। ভয় ভেঙে প্রথম প্রথম একটু কাছে এসে যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়, এই ভেবে পালিয়ে না গিয়ে দিদির কাছেই অপেক্ষা করতে লাগল। এই অপেক্ষা করার সুফল হিসাবে দুটো বাদাম হয়ত হাতে হাতে নগদ দক্ষিণা হিসাবে পেতে লাগল। এতে আবার ভয়টা আরো কমল ও উৎসাহটা বেড়ে গেল। তার ফলে ক্রমে ক্রমে দিদির হাত থেকে পর্যন্ত খাবার নিয়ে যেতে লাগল। এর পরের ধাপ হিসাবে, দিদি কাঠবেরালীটার গায়ে রামচন্দ্রের মত হাতবুলিয়ে দিতে লাগলেও কাঠবেরালীটা তাতে আপত্তি করা তো দূরের কথা, বরং উপভোগই করতে লাগল।

দিদি নিজের শোবার ঘরে, একটি ছোট্ট দোলনা খাটালেন। কাঠবেরালীটার জন্য তার উপরে কাপড় চোপড় পেতে একটা বিছানাও করে দিলেন। ক্রমে কাঠবেরালীটা বিছানার আরামটা বুঝতে শিখে, রাত্রে প্রতিদিন এসে ওই বিছানাতেই শুতে আরম্ভ করল। খাওয়াটা তো ওই বাড়ীতেই চলছিল। এখন আহার ও বাসস্থানের বদলে সে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল দিদির পোষা কাঠবেরালী। কাঠবেরালীরও দিদির উপর আব্দার ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

ছোট্ট শরীর ওদের। গায়ের উত্তাপও বেশী। তাই ওদের খুব ঘন ঘন খেতে হয়। অবশ্য খায় খুব কম। আবার খাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা হজম হয়ে যায়। শারীরবৃত্তের ভাষায় বলা হয় যে এইসব ছোট ছোট প্রাণীর বিপাকক্রিয়া খুব দ্রুত। তাই ও সারাদিনের মধ্যে যখন তখনই দিদির কাছে এসে খাবারের আব্দার করতে লাগল। আর দিদিও তেমনি উদার, অকৃপণ। হয়ত একটু বিশ্রাম করছেন, এমন সময় কাঠবেরালীর আব্দার, কিছু খেতে

দেবার জন্য; কিন্তু দিদির ক্লান্তি নেই। তখুনি উঠে দেবেনই কিছু খাবার।

এমনিভাবে কাঠবেরালীটা হয়ে উঠল দিদি বাড়ীর একজন। সারাদিন সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তার মাঝে মাঝে, দফায় দফায় এসে কিছু খাবারের তাগাদা। তাগাদাটা ক্রমশঃ হয়ে উঠল ভিক্ষা। ভিক্ষা, এইজন্য বলছি, তার কারণ সকলেই দেখেছে কাঠবেরালীর সামনের পা গুলো হাতের মতন। মুখে খাবার তুলতে, কিছু ধরতে, কাঠবেরালী উবু হয়ে বসে, হাতের মতন করে সামনের পা দুটিকে ব্যবহার করে। এটা আমাদের সকলেরই দেখা। কিন্তু দিদির কাঠবেরালী ওর হাত (?) দুটিকে অন্য আর একভাবে ব্যবহার করতে শিখল। ও হাতদুটিকে প্রথমে জোড় করে, তারপর ভিক্ষা চাইবার মত করে হাত (?) দুটোকে পাততে শিখল।

প্রথম কি করে সে এটা করতে শিখল, তা বলা শক্ত। হয়ত এমনও হতে পারে, যে একদিন এইরকম করেছিল, আর তাতে দিদি হয়ত খুব মজা পেয়ে, হেসে, ওকে একটু বেশীই খাবার দিয়ে থাকবেন, তা ও বেশ মজা পেল ও তারপর থেকে ভিক্ষা করতেই শিখে গেল।

দিনের বেলা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর শেষ নেই। তারপর সন্ধ্যাটি হবামাত্র, যেখানেই সে থাক, ঘরে ফিরে এসে, ছোট্ট দোলায় তার যে বিছানা-টুকু সেইখানে এসে শুয়ে পড়বে। দিনের বেলায় যতবারই খাবার ভিক্ষা করুক, রাতে কোন গোলমাল নেই; সেই যাকে বলে, একঘুমে রাত কাবার। আর কি রকম সভ্যভব্য। বিছানা ভেজানো কি নোংরা কোনদিন করে নি।

কাঠবেরালীর ধারালো দাঁত। আর তার ছোট্ট শরীরের অনুপাত দাঁত-গুলি খুব ছোটও নয়। তাই আমাদের মনে একটা ভয় থাকে যে কাঠবেরালী বুঝি খুব কামড়ায়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল এর ঠিক উল্টো। দিদির বাড়ীতে এতদিন থাকতে থাকতে, কোন একদিনও সে একটুও কামড়ায় নি। তবে দাঁতের ব্যবহার যে একবারে করে নি তা নয়; তবে সেটা আদর করতেই।

দিদি বুড়োমানুষ। আর থাকতেনও একা। তাই ওঁর সংসারের কাজকর্ম কম। এজন্য সকালে ঘুম থেকে সাড়ে ছটা সাতটার আগে উঠতেন

না। উনি যে ঘরে শুতেন, সেই ঘরেই এককোনের খাটানো দোলনায় শুয়ে থাকত কাঠবেরালীটা। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওর ঘুম ভাংগত আর বোধ হয় ক্ষিধেও পেত! দিদি হয়ত তখনও ওঠেন নি। কিন্তু ওর আর তর সইত না। ও উঠে এসে দিদির পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের কাছে খুব আলগা করে দাঁত বসিয়ে সুড়সুড়ি দিত। কিন্তু কখনো দাঁত বসানোর চেষ্টা করত না। দিদিও একটু হেসে উঠে পড়তেন। উঠে অবশ্যই ওঁর প্রথম কাজ ছিল ওকে কিছু খেতে দেয়া।

ব্যস। সকালে উঠে পেটটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই, আর কোন গণ্ডগোল নেই।

১৮

কেউ ভীতু কেউ সাহসী

মানুষের যে রকম সাহসের কমবেশী দেখা যায়, অন্য প্রাণীদের মধ্যেও তাই। প্রাণীদের অন্য দোষ গুণ যে রকম বংশানুক্রমিক, ভয় ও সাহসটাও তাই। স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিস ভাষাভাষী বহু দেশেই বুলফাইটের প্রচলন। আমাদের দেশে ফুটবল, যে রকম জাতীয় খেলা; ও সব দেশে বুলফাইটও তাই। এক একটা বুলফাইটের ষ্টেডিয়াম কি সুন্দর ভাবে তৈরি। তাতে একলাখ দেড়লাখ লোক ধরে। তা ভর্তিও হয়ে যায় সব সময়ে। বড় বড় বুলফাইটার যারা, তাদের খ্যাতি আমাদের ফিল্ম ষ্টারদের মত। খবরের কাগজে বড় বড় ছবি বার হয় ওদের।

যেমন বুলফাইটের মত একটা বিশেষ ধরনের খেলা গড়ে উঠেছে ওসব দেশে, তেমনি এই খেলার জন্যই তৈরি করা হয়েছে প্রজাতি হিসেবে একজাতের ষাঁড়, যারা কিছুতে ভয় পায় না। খেলাটা নিষ্ঠুর। প্রথমে বুলফাইটার, যাকে মেটাডোর বলে, সে একটা লাল কাপড় নিজের সামনে ধরে ষাঁড়টাকে উত্তেজিত করে. নিজে সরে যায় ও উত্তেজিত ষাঁড়টা কাপড়ের তলা দিয়ে দৌড়ে যায়। এমনি করে করে যখন ষাঁড়টা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন মেটাডোর ও ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার হাতে মেটাডোরের রক্ষার জন্য যে পিকাডোররা থাকে তখন ষাঁড়টাকে তলোয়ার বিঁধে দেয়। এ ষাঁড়গুলো এমনই নিভীক যে পিঠে বেঁধা তলোয়ার নিয়েও তেড়ে আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মরে যাচ্ছে। দেখা যাবে এই সব ষাঁড়ের বাপ ঠাকুরদা সবাই এমনি সাহসী ছিল।

আমি কিন্তু এখানে শুধু ষাঁড়ের সাহসের কথা বলছি না। এর পরের গল্প কয়েকটা বেরালের। এগুলো আমার দেখা। এর মধ্যে প্রথম দুটো আমার ছোড়দির বাড়ীর আর শেষের দুটো দেখা আমার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী। প্রথম দুটো হল পোষা বেরাল ও শেষের দুটো উটকো বেরাল। গল্পটা শুনলে সবটা বোঝা যাবে।

ছোড়দির বাড়ীর মিনি নামের বেরালটারই দুটো বাচ্চা। বড় হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। দুটোই মাদি বেরাল। একটার নাম হল পুসী, আর একটার টুসী। দুজনের মেজাজ দুরকমের। একই মার পেটের দুই বোন হলে কি হয় একটা শান্ত, লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। আর অন্যটা ঠিক তার উল্টো। কেউ যদি বাড়ীতে এলো, পুসী যেখানেই থাকুক, এসে হাজির। ওর দেখা চাই কে এলো। প্রথমে দেখবে একটু দূর থেকে, হয়ত খাটের তলা ঘরের কোনের আলমারির পাশ থেকে। তারপর সেই লোকের মেজাজ বুঝে কাছাকাছি আসবে। কাছে এসে প্রথমে ওর চিরপরিচিত, আমার ছোড়দি কি ছোটজামাইবাবুর গায়ে গা ঘষবে। তারপর অপরিচিত লোকটিরও কাছে এসে খুব মিহি সুরে ডাকবে "ম্যাও"। তাঁর কাছ থেকে একটু উৎসাহ পেলে, তাঁরও গায়ে গা ঘষবে।

আবার কেউ এলে, টুসীর আর দেখাই মিলবে না। এমনকি তিনি যদি ওদের খাবার সময় অবধি থাকেন, তা হলে উনি সামনে থাকলে টুসী আর খেতেই আসবে না। ওকে হয় আলাদা জায়গায় খেতে দিতে হবে, আর না হয় তো অপরিচিত ভদ্রলোককে ওর খাবার জায়গা থেকে সরে যেতে হবে। এমনকি আমি, যে ওখানে প্রায়ই আসতাম যেতাম, আমাকে পর্যন্ত টুসী দূরে দূরে রাখত।

কামারহাটিতে আমার ছোড়দির বাড়ীর লাগাও মস্ত বাগান ছিল। বারান্দার পাশেই ছিল কটা নারকেল গাছ। তার একটু বাইরে কয়েকটা তালগাছও ছিল। তাল ও নারকেল গাছ থেকে পড়লে বেশ জোর আওয়াজ হয়। অনেক সময়েই এই আওয়াজ শোনা যেত। এই শব্দ সম্পর্কে পুসী আর টুসী দুজনের মনোভাব ছিল ভিন্ন। টিপ করে শব্দটি কানে গেলেই টুসী যেন চমকে উঠত। শুধু চমকে ওঠাই নয়; তখনি ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়ত; কি ছোড়দি বা ছোটজামাইবাবু কাছে থাকলে ওদের কোলে উঠে পড়ত। সেই জায়গায় পুসী এ রকম কোন শব্দ হলেই তখনি ওর দেখা চাই কিসের শব্দ, কোথা থেকে এল। এ জন্য পুসী হয়ত ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দায় গিয়ে রেলিং থেকে উঁকি মেরে দেখত। দেখে যে কি বুঝতে তা জানি না। কিন্তু নিজে দেখে না আসা অবধি ওর শান্তি নেই। একজনের যত সাহস, অন্যজনের তত ভয়।

এবার আমার ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীর সেই উটকো বেরাল দুটোর কথা বলি।

কোথা থেকে যে ও দুটো জুটেছিল কে জানে। যতই চেষ্টা করা হয় তাড়ানোর জন্য, এমনকি মার ধোর পর্যন্ত গ্রাহ্য না করে বেরালদুটো থেকেই যায়। কিছুতেই কিছু হয়না দেখে, ওই বাড়ীর একজন বেরাল দুটোকে একদিন এমন প্রহার দিলেন, যে দুটোই অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইল। বাড়ীর মেয়েরা এ রকম প্রহারের বিষম বিরোধী হন। তাই বাড়ীর মেয়েরা বকাবকি করতে লাগলেন। কিন্তু বকাবকি যতই হক, একটা ফল হল। বেরালদুটো একটু সুস্থ হয়েই, ওদের মধ্যে একটা চলে গেল, আর ফিরল না। কিন্তু আর একটা ?

দেখতে দেখতে কালীপূজা এসে গেল। যিনি মার দিয়েছিলেন, তাঁর মাথায় আর একটা ফন্দি এলো। এ ব্যাপারটায় মহিলারা আপত্তি করতে করতে হয়ত একটা নাটকীয় কিছু ঘটে যাবে। এই ভেবে তিনি বেরালটা ধরে ও ল্যাজের সঙ্গে কয়েকটা ফুলঝুরি বাঁধলেন ও তারপর সেগুলো জ্বালিয়ে দিলেন।

বেরালটা ভয়ে আঁতকে উঠে পালাল। কোথায় পালাল তা আজো কেউ জানে না।

১৯

লড়াকু মাছেরা

সখ করে যাঁরাই এ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ পুষেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় এমন কেউই নেই যিনি অন্ততঃ এক আধবারও "সায়ামিজ ফাইটার" মাছ পোষেন নি। উজ্জ্বল আবিরের মত লাল, কি ঘোর কালো, না হলে চোখে লাগে এ রকম ভায়োলেট রং, এমনি কত রকম রংয়ের যে এই ফাইটার হয় তার আর শেষ নেই। যে রকম চোখ ধাঁধানো রঙের জন্য লোকে এ মাছ পোষে, তা ছাড়াও আর একটা বিশেষ সৌন্দর্যের জন্য এ মাছের কদর, অন্ততঃ এ দেশে; তা হল এ মাছের পাখনা। সমস্ত মাছেরই কয়েকটি বিশেষ পাখনা আছে। এর মধ্যে একটি পিঠে ও একটি তলদেশে থাকে। তা ছাড়া দুপাশে দুটি আরও ল্যাজ ও একটা পাখনা। সায়ামিজ ফাইটার মাছের এই সব পাখনাগুলোই বড় বড় সাইজের হতে পারে। কোন কোন মাছের এই পাখনাগুলো অস্বাভাবিক রকমের বড় হতে দেখা যায়।

আমরা যে কারণেই এ জাতের মাছ কিনি না কেন, সায়াম দেশ অর্থাৎ থাইল্যান্ডে এ মাছ পোষা হয়, একটা মাছের সঙ্গে আর একটা মাছ এক জায়গায় রেখে, তাদের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়ে। এই মাছ এমনই মারকুটে যে একবার মারামারি সুরু হলে রক্তারক্তি হয়ে যেতে থাকে এই মারপিটে। এ মারপিটের অস্ত্র হল ওই পাখনাগুলো। বলাবাহুল্য যার যত বড় পাখনা, তার সুবিধা ততটা বেশী। থাইদেশে এই মারপিটের উপর বাজি ধরা হয়। কাজেই ওদের দেশে এ মাছের অন্য একটা মূল্য। বহুকাল ধরে এই রকম মারপিটের পরিবেশে থেকে ওই সব মাছ একেবারে মারাত্মক মারকুটে হয়ে উঠেছে। একটি পুরুষ মাছের সঙ্গে আর একটি পুরুষ মাছের দেখা হলে আর রক্ষা নেই। ওমনিই মারামারি।

শুনেছিলাম অন্য একটি মাছেরও থাকার প্রয়োজন নেই। এ্যাকোয়েরিয়ামের মধ্যে একটা আরসি রেখে দিলেও না কি ওই একই রকমের তুলকালাম ব্যাপার হয়। এ পরীক্ষাটি আমি নিজেও করেছি।

আমাদের বাড়ীর এ্যাকোয়ারিয়ামে একটা লাল রঙের সায়ামিজ ফাইটার মাছ ছিল। এ মাছেরা যখন একটা মাছ একা থাকে, তখন এদের মত শান্তশিষ্ট আর কেউ নেই। এমনকি অন্য মাছেরা এ্যাকোয়ারিয়ামটার এদিক ওদিক, উপর নিচে ঘোরাঘুরি করে যেন চষে ফেলছে, আর সেই জায়গায়
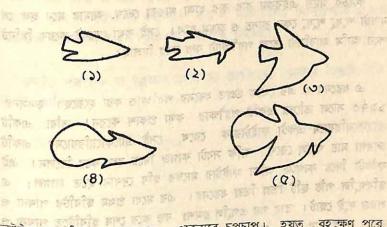
ফাইটার মাছ নিচে একজায়গায়, একেবারে চুপচাপ। হয়ত বহুক্ষণ পরে একবার এদিক থেকে ওদিক, কি ওপরের দিকে এলো। লক্ষ্য করতাম যে আমাদের এ্যাকোয়েরিয়ামের ফাইটার মাছটাও ঠিক এমনি। টকটকে লাল, ইঞ্চি দেড়েক লম্বা, ল্যাজ আর পাখনাগুলো যেমন বড় ছিল মাছটার, ঠিক তেমনি শান্ত মনে হত মাছটাকে। একদিন পরীক্ষা করবার জন্য আমি একখানা দাড়ি কামানোর আরসি এনে সোজা করে এ্যাকোয়েরিয়ামের কাছে ধরলাম।

আরসিটা ধরার পর, প্রথম তিন চার মিনিট কিছুই হল না। আরসিতে নিজের ছায়াটা লক্ষ্য করতেই বোধ হয় এই কয়েক মিনিট কাটল। তারপর মাছটার যেন একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। পাখনাগুলো সব মেলে দিয়ে, শরীরটাকে যেন কেমন গোল মতন করল। শরীরটা গোল করার অর্থ হল শরীরের সব মাংসপেশী গুলোকে সঙ্কুচিত করা, যার মানেটা হল যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া আর কি। তারপর এগিয়ে এলো আরসিখানার দিকে। আরসিখানাকে আমি রেখেছিলাম এ্যাকেয়েরিয়ামের কয়েক ইঞ্চি দূরে, সমস্ত ঘটনাটা ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্য। এই দূরত্বের জন্য, আসল মাছটা আরসির ছায়ার মাছের কাছাকাছি আসতে পারছিল না। সেই জন্য এগিয়ে

এসে বার বার এ্যাকোয়ারিয়ামের কাঁচে ধাক্কা খাচ্ছিল। অবশ্য আমি যদি আরসিটা এ্যাকোয়েরিয়ামে ঠেকিয়েও ধরতাম, তা হলেও সেই একই ব্যাপার ঘটত। কেন না, ছায়ার মাছটার কাকে তো আর আসল মাছটা পেঁছতে পারত না, তাই এমনিভাবেই কাঁচের গায়ে ধাক্কা খেত।

কাঁচের গায়ে এইরকম বার বার ধাক্কা খাওয়া দেখে, আমার মনে হল যে মাছটা শ্‌ধ্‌ শ্‌ধ্‌ কেন ক্লান্ত ও জখম হবে। সেই কথা ভেবেই কয়েক মিনিট পরে আমি আরসিটা তুলে পরীক্ষাটা বন্ধ করে দিলাম।

এ ধরনের ও এর থেকে উন্নত ধরনের পরীক্ষাও করা হয়েছে। ডনসনরা ১৯৭৩ সালে তাঁদের একটি পরীক্ষার কথা প্রকাশ করেন। তাঁরা একটি এ্যাকেয়েরিয়ামে একটা ফাইটারকে রেখে, সেই এ্যাকোয়েরিয়ামের একটি জায়গা মাত্র খ্‌লে রেখে, বাকি সবটা কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। এই ফাঁকটা দিয়ে কাগজে আঁকা ফাইটার মাছের ছবি দেখান হতে লাগল। এ ছবিগ্‌লি পাঁচ ছটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এর মধ্যে প্রথম ছবিটির পাখনা ও ল্যাজ দ্‌ই ছোট। তার পর এগ্‌লি ক্রমশঃ বড় করে শেষ ছবিটিতে পাখনা ও ল্যাজ সবই খ্‌ব বড়। পরীক্ষায় দেখা গেল, গোড়ার চার পাঁচটি ছবির উপর মাছটার রাগ অবশ্যই আছে। আমার পরীক্ষায় যেমন দেখেছি, তেমনি তেড়ে আক্রমণ করতে যায়। কিন্তু তার পরিমাণের কমবেশী খ্‌ব একটা নেই। কিন্তু যে ছবিটার ল্যাজ পাখনা সবই খ্‌ব বড়, তার বির্‌দ্ধে পরিমাণগত ভাবে যেন রাগটা অনেক বেশী।

এ পরীক্ষা থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস বোঝা যায়। বোঝা যায় ল্যাজ কি পাখনাগ্‌লো মাছের য্‌দ্ধ বা আত্মরক্ষায় কত বড় জিনিস। জীবন্ত কই বা খলসে মাছের কাঁটা মারা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে কানকো দ্‌টোর ঠিক পাশে যে পাখনা থাকে তাই দিয়েই ওরা কাঁটা মারে। মাছ কোটবার সময় খ্‌ব যত্ন করে এই পাখনাগ্‌লো, যার ভিতরে চামড়া ঢাকা হাড়, অর্থাৎ কাঁটাই শ্‌ধ্‌ থাকে, সেগ্‌লো বাদ দেয়া হয়। ফাইটার মাছ যে হেতু লড়াকু মাছ; তাই বিবর্তনে এদের শরীর মাত্র ইঞ্চি দেড়েক হলেও, সেই অন্‌পাতে পাখনা গ্‌লো খ্‌ব বড়। এমনকি শরীরটার চেয়ে পাখনা ও ল্যাজই বড়। ওমন গাঢ় রং, তার উপরে এমন পাখনা, এই জন্যই আমাদের এ মাছ পছন্দ হয়, আমরা এ্যাকোয়েরিয়ামের জন্য এ মাছ কিনি। অবশ্য কোন দেশে,

একটার সঙ্গে আর একটার লড়াইয়ের জন্যই এ মাছ রাখা হয়। মাছের সেই আচরণভঙ্গীটা লক্ষ্য করার জন্য কত সহজ পরীক্ষায় কত সুদূর প্রসারী ফল পাওয়া যায়, তাও জনসনরা দেখিয়েছেন। জনসনদের পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই মাছেরা শুধু যে রংই দেখতে পায় তা নয়, বড় পাখনা ও ল্যাজও লক্ষ্য করতে পারে। আর শুধু লক্ষ্য করাই নয়, আমরা যেমন হিংসা করি, ও মনে হিংসা হলে যে রকম ব্যবহার করি, এই মাছের আচরণও যেন কতকটা সেই ধরনের। তবু এ কথা ঠিকই নিম্নপ্রাণীর এ সব আচরণের মূলে আছে ইন্‌স্টিংট বা সাহজিক প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি সাহজিক বা সহজাত হোক না প্রাণীদের, আমরা কিছুই তার আজো জানি না।

২০

পায়রা ও বাজপাখী

খুব একটি জনপ্রিয় গান, স্মৃতি থেকেই তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যদি দু একটি কথা এধার ওধার হয়, কবি বিমল ঘোষের কাছে পর্যন্ত ক্ষমা চাইছি।

"উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা
দুপুরের নির্মল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে"

—বিমল ঘোষ

আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ীর লোকেরা পায়রা পোষে। প্রায় তিরিশ চল্লিশটা পায়রা রোজ সকালে ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। সাদা পায়রাগুলোর উপরে সকালের সোনালী রোদ্দুর পড়ে কি অপূর্ব যে দেখায়! আর তাই দেখতে দেখতে আমার ওই গানখানি মনে পড়ে।

পায়রারা যখন ওড়ে, একটা মোটামুটি গোল এলাকা জুড়ে থাকে ঝাঁকটা। ঝাঁকের মধ্যে দেখা যায় বেশ কয়েক ফুটের মত দূরত্ব একটা পায়রার সঙ্গে আর একটা পায়রার। সমান গতি বলে যত উঁচুতেই উড়ুক না কেন, এ দূরত্বটা সমান থাকে। আকাশের একটা এলাকাকে মোটামুটি গোলভাবে এই ঝাঁকটা পরিক্রমা করে। দিক পরিবর্তন করবার সময়, মোটামুটি যে বৃত্তাকারে পায়রাগুলো উড়ছিল, সেইটা অল্প কিছুক্ষণের জন্য একটু চ্যাপটা কি লম্বাটে হয়ে গিয়ে আবার তেমনি একটা পায়রার সঙ্গে আর একটা পায়রা যতটা দূরে থাকার কথা, সেইটা আবার ঠিক হয়ে যায়। প্রত্যেকদিন সকালে আমাদের বাড়ীর উত্তরদিকের ঝোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পায়রাগুলোর ওড়া লক্ষ্য করতাম।

কখনো কখনো একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। পায়রাগুলো খুসীমত বেশ উড়ছে, এমন সময় দেখলাম দূরের আকাশে, চিলের মত বাঁকা ডানা একটা পাখী বিদ্যুতের মত ওই পায়রার ঝাঁকের দিকে উড়ে আসছে। বুঝলাম একটা বাজপাখী। বুঝে একেবারে সিঁটিয়ে উঠলাম। এখনি এই ঝাঁকের পায়রাগুলোর মধ্যে অন্ততঃ একটাকে ধরে নিয়ে গেল বুঝি।
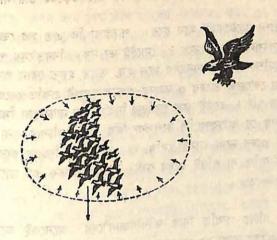
দেখতাম বাজপাখীটা যখন অনেক দূরে, পায়রাগুলো বাজপাখীর আসাটা ঠিক লক্ষ্য করে, তাদের একটার সঙ্গে আর একটার দূরত্বটা কমিয়ে ফেলে, একেবারে একটা আর একটার গায়ে গায়ে যেন চলে আসত। আর সেই সঙ্গে আর একটা কাজ। সব পায়রাগুলো একসঙ্গে ডানা মুড়ে, পাকা ফল ঝরে পড়ার মতন টপ করে নেমে এসে ছাদের ঠিক ওপরে পৌঁছে, ডানা নেড়ে ছাদে নেমে আসত। আমি যত দিন দেখেছি, তার মধ্যে এই কৌশলে ওই ঝাঁকের সব পায়রাকে বেঁচে যেতে দেখেছি।

এখন ওই কৌশলটার কথা বলি। যদি পায়রাগুলো আকাশের একটা বড় এলাকা জুড়ে ওড়ে, তা হলে বাজের পক্ষে এতবড় একটা জায়গা থেকে পায়রাগুলোর কারুকে না কারুকে ধরে ফেলা সম্ভব হবে। আর একটা ছোট এলাকায় তারা থাকলে, সেই সম্ভাবনাটা অনেক কম হয়ে যাচ্ছে। তাই বাজপাখী নজরে পড়ামাত্র, পায়রাগুলো পরস্পরের কাছে চলে আসে। ডানাগুলো মুড়ে ফেলার কারণও দুটি। প্রথম, বাজপাখী নিজের ঠোঁট কি

নখ দিয়ে পায়রার ডানাটাই ধরতে চায়। অন্য কারণ হল, ডানাটা খোলা থাকলে পায়রাটার শরীরের ধরবার উপযুক্ত আয়তন, মানে ধরবার জায়গাটাই বেড়ে গেল। তাতে বাজের ধরাটা অনেক সহজ হয়ে গেল। এটা বাঁচানোর জন্যই ওরা ডানা মুড়ে ফেলে। তা ছাড়া ডানা মুড়ে ফেললে, টুপ টুপ করে ঝরে পড়ার মত এক মুহূর্তে বাসায় পৌঁছে যাচ্ছে। বাঁচার পক্ষে সেটাও বড় কথা। বাজের তাড়া খাওয়া পায়রারা, সেদিন আর উড়তেই চায় না।

একটা প্রশ্ন অনেকেরই মনে হবে। পায়রারা কি এত সব ভেবে চিন্তে বাঁচার এই কৌশলগুলি নিয়েছে ? মোটেই তা নয়। বিবর্তনের পথে কোন কাজ, যা কৌশলের মত আমাদের মনে হয়, তাতে হয়ত কোন প্রাণী বেঁচে গেছে। যারা বেঁচেছে তাদের ও তাদের বাচ্চাকাচ্চাকেই প্রকৃতি বেছে নিয়েছে, বাঁচার উপযুক্ত বলে। একেই বলে প্রকৃতির নির্বাচন বা ন্যাচার‍্যাল সিলেকশান্। পায়রার ক্ষেত্রে যে আচরণগুলি বংশপরম্পরায় ওরা বাঁচবার জন্য পেয়েছে, সেগুলিকেই ওদের মধ্যে আমরা দেখি, যা ওরা বিনা বিচারে করে। কারণ বিচার করার বুদ্ধি বা শক্তিই ওদের নেই। আর প্রকৃতিও এই ভাবেই ওদের বাঁচার উপায় করেছে।

পায়রার বাঁচার পদ্ধতি নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের অনেকেই অনেক কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে ১৯৭৮ সালে কেনওয়ার্ডের কাজেই উল্লেখ করা উচিত। তিনি পোষা বাজপাখী ব্যবহার করে ও ঝাঁকের পায়রার সংখ্যা এক, দুই থেকে দশ, এগারো থেকে পঞ্চাশ ও তার বেশী করে এ পরীক্ষা করেছেন। এ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে যখন একটি পায়রা থাকে তার পক্ষে বাজপাখীর মুখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা যেখানে শতকরা আশিভাগ, ঝাঁকে এগারো থেকে পঞ্চাশটি পায়রা থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা দশ। তার মানে, এগারো থেকে পঞ্চাশটা পায়রা ঝাঁকে থাকলে, ওদের বাঁচার পক্ষে সুবিধা। আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম আমি যে পায়রার ঝাঁকটি লক্ষ্য করতাম, তাদের সংখ্যা ঠিক এই পর্যায়ের বলেই, আমি তাদের রোজই বেঁচে যেতে দেখেছি। আরো বেশীদিন ধরে দেখলে তবেই হয়ত বাজপাখীর পায়রা ধরা দেখতে ভালই হয়েছে যে তা হয় নি।

যে পরীক্ষার কথা বললাম, তার একটা দিক আছে। পায়রারা সংখ্যায় যখন একটু বেশী থাকে, মানে ওই এগারো থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, তখনই তাদের পক্ষে বাজ পাখী যে আসছে, এটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব হয়। পুরো ঝাঁকের একটা পায়রাও যদি বুঝতে পারে, তা হলে সে সতর্কতা

নেবার সঙ্গে সঙ্গে, চোখের নিমেষে ইসারা পেয়ে, অন্য পায়রারাও সতর্ক হয়ে যায়। তাই একা একা থাকার চেয়ে একটা মাঝারি দলে থাকার সুবিধা অনেক বেশী।

দল বেঁধে থাকার সুবিধাটা শুধু বাঁচার ক্ষেত্রেই নয়, খাবার জোগাড় করার ক্ষেত্রেও আছে। অনেকে একসঙ্গে থাকলে, একজন না একজন খাবারটা দেখতে পারে, তখন তার দেখাদেখি সকলেই খাবারের কাছে পেঁাছতে পারে। তবে অবশ্য একটা কথা আছে। দলটা যদি খুব বড় হয়, তা হলে হয়ত খাদ্যটা সকলের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে উঠতে নাও পারে। তাই সংখ্যাটা খুব কম বা খুব বেশী না হয়ে একটা মাঝামাঝি হওয়া দরকার। কিন্তু ছোট বা মাঝারি, দলটা যে রকমই হোক, আত্মরক্ষার তো বটেই, খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও যূথবদ্ধতা কতটা সাহায্য করে তা দেখা যায় অন্য শিকারী প্রাণীদের আচরণে। যাঁরা সিংহের আচরণবিধির বিশেষজ্ঞ, তাঁরা বলেন যে সিংহের মত বলশালী প্রাণীদেরও যখন জেব্রা কি বড় হরিণ বা মহিষজাতের প্রাণী ধরতে হয়, তখন দলে থাকলে সুবিধা বেশী। আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে বাজপাখীর মত প্রাণীর, যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে শিকার করার মত বুদ্ধি থাকত, তা হলে তাদের সাফল্যের পরিমাণ অনেক বেশী হত।

তবে পায়রারা সহযোগিতা করে বেঁচে যাচ্ছে, আর বাজপাখীরা তা করতে না পারায় প্রকৃতিতে একটা সামঞ্জস্য থেকে যাচ্ছে।

২১

ঈশপের কাক

কোন জিনিস অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এটা বোঝাতে আমরা বলি কাকের বাসা। কিন্তু বাসা যেমনই হোক, সে বাসার উপর দরদ কাকের অন্য কোন প্রাণীর চেয়ে কম নয়, এমনকি একটু বেশী কি না এটাই ভাববার কথা। হয়ত এমনও হতে পারে যে যেটুকু বেশী দেখায়, সেটা আমাদের মনে হয়, কাকেরা অনেক চটপটে বলে। আর কাকের বুদ্ধিও একটু বেশী, তাও হতে পারে। অবশ্য এর সঠিক মাপ করা হয়েছে বলে মনে হয় না, তবু আমরা পুরুষানুক্রমে বলে আসছি যে পশুর মধ্যে শেয়াল, পাখীর মধ্যে কাক, আর মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত। ধূর্ত কথাটা ব্যবহার করলাম, এতে নাপিতরা কিছু মনে করবেন না। আগেকার দিনে ঘরোয়া কথায় বুদ্ধিমান এটা বোঝাতে ধূর্ত কথাটার ব্যবহার হয়েছে। এখন হয়ত কথাটার ব্যবহার কমে মানেটা বদলে গেছে। এককথায় বলতে পারি যে কথাটা ক্ষয়ে গেছে।

আমাদের বাড়ীর পাশে একটা বেলগাছ। প্রত্যেক বছর দুবার করে এই গাছে কাকেরা বাসা করে। তাই আমাদের বাথরুম কি ছাদ থেকে এই বাসার কাকেদের বিভিন্ন কীর্তিকলাপ, আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। আচরণটা আবার একতরফা তো হয় না। একটি প্রাণীর সঙ্গে আর একটি প্রাণীর, তা সে একজাতের হোক বা ভিন্নজাতের হোক, যোগাযোগ কি ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই দেখি এদের আচরণ।

বেরাল, কি বেরাল জাতের প্রাণী, যেমন চিতাবাঘ বেশ সহজেই গাছে উঠতে পারে। ওদের পায়ের বাঁকানো বাঁকানো নখ, যা আবার ওরা ইচ্ছামত থাবার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে পারে, আবার বার করতেও পারে, এরই সাহায্যে এরা গাছের গুঁড়িতে নখ আটকে গাছের উপরে ওঠে। এই জাতের প্রাণীদের মধ্যে আবার যাদের শরীরের ওজন যত কম, তারা তত সহজে গাছে

বাচ্চারা ওঠে সব চেয়ে বেশী। এমনকি বেরালের বাচ্চারা অকারণে বৃষ্টির জলের পাইপের ভিতর ঢুকে, তিনতলার ছাদে পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়। জল ঢেলে, খোঁচা মেরে কিছুতেই নামানো না গেলে শেষটায় ঝাঁঝরি ভেঙে বার করার অভিজ্ঞতা অনেক বাড়ীতেই হয়েছে।

ওঠবার মতন একটা কিছু পেলেই বেরালছানারা ওমনি সেটার গা বেয়ে বেয়ে উঠবে। একদিন দেখি একটা বেরালছানা আমাদের বাড়ীর পাশের বেলগাছে উঠছে। তখন আবার ওই বেলগাছে কাকেরা বাসা করেছে। একেবারে ছোট্ট, অনভিজ্ঞ বেরালছানাটার অবশ্য কাকের বাসার দিকে কোন নজরই ছিল না, কারণ সে তখন খাবার মধ্যে তো মার দুধই মাত্র খায়, কিন্তু কাকেরা কি তাই বলে ছেড়ে দেবে ? প্রথমটায় কয়েকটা কাক তেড়ে এলো কা কা করে। কিন্তু তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই বেরালছানাটার। তখন কাকগুলো এসে বেরালছানাটার ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল। তাতেও কি নখটা সহজে খোলে ? টানাটানি করতে করতে একটু উপরের দিকে তুলতে যেই বেরালছানাটার নখগুলো খুলে গেছে, ওমনি কাকেরা ওকে মাটিতে ফেলে দিলে। ফেলে দিয়েও শান্তি নেই, দলবেঁধে কাকগুলো মাটিতে নেমে বেরালছানাটাকে ঠোকরাতে গেল।

ভাগ্যিস উঁচু থেকে পড়লে বেরালের হাড়গোড় ভাঙে না, তাই বেরাল-ছানাটা কোনমতে পালিয়ে বাঁচে।

কাক বহু দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। আমার দেখা এইরকম আরো দু একটি ঘটনার কথা বলি। ভোরবেলায় আমাদের বাড়ীর পূর্বদিকের বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পাই নির্জন রাস্তাটায় অনেক কাক। প্রায়ই দেখেছি, একটা কাক একখানা হয়ত বিস্কুট এনেছে। একখানা আস্ত বিস্কুট। বিস্কুটটা শক্ত আর কাকের ঠোঁট ও হাঁ-এর অনুপাতে বড়। তাই দেখলাম প্রথমটায় ঠোঁট দিয়ে ধরে সেই বিস্কুটখানাকে রাস্তায় ঠুকে ঠুকে ভাঙবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিস্কুটটা এত শক্ত যে তাতেও ভাঙল না। ওই রাস্তারই এক জায়গায় বেশ খানিকটা জল জমে ছিল। জলে বিস্কুটটা ভিজলে নরম হবে, এ বুদ্ধিটাও বেশ আছে দেখলাম কাকের। কারণ দেখলাম, বিস্কুটটাকে জলে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে, বেশ খেতে লাগল। এই রকম অবস্থায় পড়লে সব কাকই এইরকম বুদ্ধি প্রয়োগ করে। আর একদিন দেখি কোথা থেকে দুটো কাক দুখানা খুব শক্ত কড়কড়ে রুটি নিয়ে এসে আমাদের পাশের বাড়ীর একতলা ছাদে বসল।

রুটিগুলো এত কড়কড়ে যে তা খেতে পারল না। ও বাড়ীর ছাদে এক বালতি জল রাখা থাকত। দেখলাম দুটো কাকই নিজেদের শুকনো রুটি দুটো ভাল করে বালতির জলে ভিজিয়ে নিলে। তারপর ভোরবেলার নির্জন ছাদে বসে সেই নরম হয়ে যাওয়া রুটি খেতে লাগল।

এর চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিতেও কাকেদের দেখেছি। তখন আমরা ভবানীপুরে গড়ের মাঠের কাছাকাছি শম্ভূনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে থাকতাম। পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখন ওই অঞ্চলে প্রচুর গাছপালা ছিল। আর কাকের উপদ্রবও তেমনি। আচার তৈরি করে, কি বড়ি দিয়ে আমার মা সেগুলি ছাদে শুকোতে দিতেন। কাকের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। শেষকালে সমাধান—তিনি একখানা জাল জোগাড় করে, কাপড় শুকতে দেবার তারে সেটা টাঙিয়ে রোদে দেয়া খাবারগুলোর উপর ঢাকা দিয়ে দিলেন। জালের তলাটা ছাদের উপর লুটিয়ে না গিয়ে ছাদে বেশ ঠেকে ঠেকে রইল। মা নিশ্চিন্ত।

ছাদে একখানা ঘর ছিল। ওটাতে আমি পড়তাম। মা এত যত্ন করে জাল খাটিয়ে কিছু কিসমিস, বাদাম, খোবানি শুকতে রোদে দিয়েছিলেন। দেখি, একটা কাক জালটা একটু তুলে ধরেছে, আর একটা, জিনিসগুলো পাচার করছে। আর ভিতরের কাকটা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত, অন্য কাকটা জালটা ধরে রইল। অবশ্য আমি যদি একটু তাড়া দিতাম, তা হলে জাল উঁচু করে ধরা কাকটা পালিয়ে যেত, আর জালের ভিতরের কাকটা ধরা পড়ে যেত। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা দেখার জন্য আমি তা করি নি। এই ব্যাপারে কাকের ধূর্ততা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমনকি আমার মনে হয়েছে যে এ ঘটনাটাও একটা ব্যতিক্রম। এ রকম রোজ ঘটবে কি ? কিন্তু তারপর আমি অজয় হোমের লেখা "বাংলার পাখী" বইটি পড়লাম।

তিনি বলছেন, "ঝাঁকা মাথায় মাছ আসছে শ্যামবাজারের বাজারে শেয়ালদার দিক থেকে। ঝাঁকা বোরা দিয়ে চাপা। একটা কাক ঝাঁকার ধারে বসে চক্ষু দিয়ে বোরার মুখ তুলে ধরেছে, আর, একটা একটা করে কাক আসছে আর একটা করে পারসে মাছ নিয়ে পালাচ্ছে। শেষে দেখি একটা কাক এসে বোরার কোন তুলে ধরে এতক্ষণ যে কাকটা ধরেছিল তাকে মুক্তি দিল। সে একটা মাছ নিতেই দুজনে উড়ে চলে গেল।"

আশ্চর্য কিছুই নেই যে ঈশপ কি বিষ্ণুশর্মার গল্পে কাক এতবড় একটা চরিত্র, প্রায় নায়কের ভূমিকাই পাবে।

২২

বাসা ঃ ভালবাসা

চড়াইপাখীর চেয়ে ঘরোয়া পাখী বোধ হয় আর নেই। এদের খাওয়া দাওয়া, বাসা করা, ডিম পাড়া, সব কিছুই মানুষের ঘরে। বোধ হয় বহু বছর ধরে এই রকমভাবে মানুষের তৈরি পাকাবাড়ীতে থাকতে অভ্যস্ত বলেই হয়ত রবি বলছেন,

"বাবুই পাখীরে ডাকি কহিছে চড়াই
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ?" শুধু থাকাই নয়, খাওয়াটাকেও মানুষের ঘরে যা খাবার পাওয়া যায়, তার সঙ্গেই চড়াইপাখী নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে।

আমার নিজের একটা অপরেশনের জন্য পি, জি, হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে ভর্ত্তি ছিলাম। ঠিক সকালের জলখাবারটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম, চিক্ চি্ক, চি্ক করতে করতে, পাথরের মেঝের উপরে পড়ে থাকা খাবারের টুকরোগুলো খেতেই আসত প্রতিদিন, জোড়ায় জোড়ায়, বেশ কয়েক জোড়া চড়াই। আর সবগুলোর ঠোঁটে ওই এক শব্দ (বুলি ?) চিক্, চিক্, চিক্। কেমন ওরা ঠিক জেনে গিয়েছিল, ঠিক ওই সময়ে জল খাবারের পাট শেষ হল।

ঘরের ভিতর ঢুকে খাবারের চেষ্টা করা তো রোজকার দেখতা ব্যাপার। কিন্তু আমার যেটাতে সব চেয়ে বেশী কৌতূহল লাগত, তা পাখীদের শব্দে। যেমন ওই চড়াই পাখী দেখেছি খাবারের কাছাকাছি এসে খুব আস্তে চিক্, চিক্, চিক্ করে শব্দ করে। আবার কখনো চিরিপ, চিরিপ, চিরিপ এই রকম শব্দ। কখনো চর্‌বর্, চর্‌বর্ এই রকম শব্দ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। ওই চিক্, চিক্ শব্দটা অনেক মৃদু। এটা শুনে আমার অন্তত মনে হয়েছে যেন এতে একটা মিনতির সুর। লক্ষ্য করেছি আমাদেরই বাড়ীর দালানে বাসা করে পুরুষ পাখীটা ওইরকম শব্দ করে যেন মেয়ে পাখীটাকে ডাকছে। এটা অবশ্য আমার মন গড়াও হতে পারে।

১৯৭৩ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে পক্ষীতত্ত্ববিদদের এক আন্তর্জাতিক সভা হয়। সেই সভায় কে নেলসন একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাঁর প্রবন্ধে তিনটি প্রশ্ন ছিল। প্রথম প্রশ্নটি হল, পাখীর গান কি সঙ্গীত ? তা হলে কি ভাষা ? এর রূপ কি ?

প্রাণীজগতের আরো বহু পারস্পরিক সঙ্কেতের মধ্যে পাখীর ডাক যে একটি, তা সহজেই বোঝা যায়। কুকুর বা বাঘ, সিংহ, গরু, ষাঁড়; এদের সকলেরই ডাক যে ধরনের সঙ্কেত বোঝায়, পাখীর ডাক তার চেয়ে ভাল ছেড়ে খারাপ সঙ্কেত নয়। বাঘ, সিংহ, ষাঁড় যখন গর্জন করে, তাতে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একটি হল যতটা এলাকা পর্যন্ত গর্জনটা শোনা গেল, ততটা এলাকা তার। এমনকি এও দেখা গেছে অন্য কোন সিংহ কি ষাঁড় গর্জন শুনে সে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। আর অন্যটি হল, গর্জন স্ত্রীজাতের প্রাণীদের আকর্ষণ করা। তার মানে, একই শব্দ পুরুষ আর স্ত্রী প্রাণীদের কাছে ভিন্ন মানে নিয়ে আসছে। প্রকৃতির নিয়মটাও চমৎকার। যে প্রাণীর যতটা এলাকা দরকার, তার ডাকও যেন তত জোর। যেমন সিংহের শিকারের বড় এলাকা চাই, তাই তার গর্জন এত জোরালো। পাখীদেরও চরে খাবার জন্য অনেকটা এলাকা দরকার, তাই তাদের গানও বহুদূর থেকে শোনা যায়।

পাখীর ডাককে ভাল, অর্থাৎ আরো বেশী সফল সঙ্কেত কেন বললাম, তাই আলোচনা করি। ময়না, কাকাতুয়া, গ্রে প্যারট, শালিক, টিয়া এইসব পাখীদের নানা রকমের শব্দ অনুকরণ করতে শেখানো যায়। বন্য অবস্থায় ওরা এই ভাবে অন্যপ্রাণীর শব্দ নকল করে, আক্রমণকারী প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে আত্মরক্ষা করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এদের সঙ্কেতের সাফল্য বেশী।

একটু আগে তোলা নেলসনের প্রবন্ধে ফিরে আসি। নেলসন পাখীর গানকে বলছেন, অনেকটা ঘুমপাড়িয়ে বোঝানর (hypnotic persuasion) মত; যে রকম আমরা দুরন্ত বাচ্চাদের করি। নেলসনের এ আবিষ্কারে একটা গভীর সত্য আছে বলে মনে হয়; যখন আমরা ইংরাজ মহাকবি কীটসের সেই জগৎ বিখ্যাত কবিতা "Ode to a Nightingle" প্রথম লাইনগুলোর কথা ভাবি ঃ

My heart aches and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I have drank"

কবি কীটস্ ঘুম-টেনে-আনা অসাড় ভাবের কথা বললেন কেন ? এই সব কবি-মানুষের স্নায়ুর গ্রহণ ক্ষমতা ও অনুভূতিশীলতা সাধারন মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। তাই নেলসন যে আবিষ্কার করবেন, তার বহু আগে কীটস্ সেই কথাই যেন বলে গেলেন।

চিক্ চিক্ চিক্ করে খুব আস্তে আস্তে চড়াইয়ের ডাকের কথা বলছিলাম না ? সে ডাকটা যেন ঘুমপাড়ানি সুরে মেয়ে পাখীটাকে বাসায় আসার জন্য বার বার করে ডাকছে। আওয়াজটা শুনে আন্দাজে আমার যা মনে হচ্ছিল, নেলসনের আবিষ্কারের মধ্যে যেন তার একটা সত্যিকারের মানে খুঁজে পাওয়া গেল।

বাড়ীর দালানে কি ঘরে চড়াইরা যে বাসা করে, তা করবার সময়, কি সঙ্গিনী জোটানোর সময় চড়াইদের মারপিট কি ঝগড়া হয়না বললেই চলে। যে, যে জায়গাটা প্রথম দখল করল, তার সেই জায়গা। আর স্ত্রীর ব্যাপারেও কতকটা তাই। ডেভিস এক বিশেষ ধরনের প্রজাপতির উপর পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে বাসা করার ব্যাপারে, যে আগে এসে বাসা করেছে তার অধিকার পরে যে এলো সে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে না। ঠিক ওইরকম নিরীহ হল যাদের রেড ডিয়ার বলে, সেই জাতের হরিণ। মাথায় বিরাট বিরাট সিং থাকা সত্ত্বেও, হরিণীকে আয়ত্ত করবার জন্য এরা তা ব্যবহার করে না। যার গর্জন বেশী সেই জেতে।

পাখীর গানের কথায় আমার মনে অনেক সময় একটা প্রশ্ন জেগেছে। পাখীর গলার শব্দের কি কোন একক, যাকে আমাদের আমাদের শব্দে আমরা শব্দাংশ বা সিলেব্ল বলি, তা আছে ? মানবশিশু কিন্তু এইগুলো জুড়ে জুড়েই কথা বলতে শেখে। যেমন বলে বা-বা-বা। তা পর বলতে শিখবে বাবা। এমন হতে পারে পাখীদেরও এইরকম একক আছে। এখানে চড়াই-পাখীর কথা বলছিলাম। এই যে স্ত্রী চড়াইকে বাসায় আসার জন্য চিক্-চিক্ শব্দ, এটা হয়ত একেবারে মূল আর প্রাথমিক আওয়াজ। কিন্তু "চ" ও "ক"এর "র", "প" মেশানো যে সব জটিলতর শব্দ ওরা করে; বিশেষ করে যখন সকলে মিলে ধুলো মেখে "ধূলোচান" করে সেই সময়ে, তা অনেক জটিল ও তাতে বহুশব্দাংশ আছে। হয়ত সেটা আনন্দের ভাষা, আমাদের সাহিত্যের ভাষার মতন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি। ক্যানারি চড়াই জাতের পাখী। এরা যে রকম সুন্দর শিষ দেয়, তা কিন্তু পুরোপুরি জন্মগত বা প্রজাতিগত নয়। ডিম হবার সঙ্গে সঙ্গে, যদি ক্যানারিদের কাছ থেকে সে ডিম সরিয়ে

অন্যত্র ফোটানো হয়, তা হলে সেই পাখীরা আর শিষ দিতে পারে না। পারলেও সেটা একটু অন্যরকম। চড়ায়ের কিছু সরল আর কিছু জটিল শব্দ আছে। ডিম অবস্থা থেকে সুরু করে বংশানুক্রমে চেষ্টা করলে ওদের ক্যানারির মত শিষ দিতে কি অন্য কিছু শেখান যাবে কি ? জানি না। আমার নিজেরই সেই প্রশ্ন।

২৩

জ্যামিতির পারমিতি

জ্যামিতিকে প্রাচীন গ্রীকরা বড় শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এই শ্রদ্ধাটা এত, যে জ্যামিতিকে প্রায় স্বর্গীয় জিনিস বলেই যেন তারা মনে করত। কারণ হয়ত তারা লক্ষ্য করেছিল যে প্রকৃতির সৃষ্টিরও অনেক কিছুতেই জ্যামিতির গড়নের সৌন্দর্য দেখা যায়। যেমন একটি চিনি কি নুনের দানা নির্ভুল ভাবে চৌকোনা। আবার হয়ত অন্য কোন পরিশ্রুত রাসায়নিক কঠিন পদার্থের দানার চেহারাটা অন্য রকমের। অন্যরকম হলেও তার একটা জ্যামিতিক প্যাটার্ন কিন্তু থাকে। এর কারণ কি ? বিজ্ঞানে এর কারণটা সহজেই পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান বলে যে পদার্থের এই জ্যামিতির গড়নে দানাদার অবস্থা, এটা হচ্ছে একটি অনুর সঙ্গে আর একটি অনুর যে আনবিক বাঁধন, সেটাকে কঠিন করতে। অনু পরমানুগুলো কি রকম গড়নের, তার উপরেই আসলে নির্ভর করে জ্যামিতিক গড়নটা চৌকোনা হবে, না লম্বাটে হবে। কিন্তু শক্ত ও কঠিন হতে গেলে, তাতে আনবিক বাঁধনটা এইরকম দানাদার হতেই হবে। এর এর উদাহরণ হল, কয়লা আর হীরা। যে কয়লায় আমরা রাঁধি, আর যে হীরাতে অলঙ্কার, সেই দুটো রাসায়নিক দিক থেকে এক। দুটোই হল অঙ্গার বা কার্বন। হীরাটা দানাদার অবস্থায় আছে বলে তা সব চেয়ে কঠিন। আর কয়লা সহজেই ভেঙ্গে যায়।

জ্যামিতি আর রসায়ন শাস্ত্র পৃথিবীতে জন্মাবার অনেক আগে থেকেই প্রাণীরা কিন্তু তাদের ঘরবাঁধা বা ওই ধরনের কাজে, যেখানটার বাঁধন একটু শক্ত হতে হবে, সেখানে কিছু না জেনেও এইরকম জ্যামিতিক প্যাটার্ন করেছে। করেছে বলব না প্রকৃতি করিয়েছে বলব ? কি বলা হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। কি হচ্ছে সেটা বোঝাই বড় কথা। এই ধরনের জ্যামিতিক প্যাটার্নের ব্যবহার প্রাণীজগতে এত অজস্র যে তারই উপর একটা বই লিখে ফেলা যায়। যেমন মাকড়শার জাল, কি মৌমাছির চাক। এই দুটি আবার ঠিক ছ' কোনা। মৌমাছির চাকের প্রতিটি কামরা ছ' কোনা হতেই হবে। অবশ্য মাকড়শার জাল

সব সময়ে ঠিক তা না হয়ে আর একটু অন্য জ্যামিতিক গড়নেরও হতে পারে। কিন্তু ঝোঁক ছ' কোনাতেই। কেন ? বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ছ' কোনা গড়ন হলে, তার বাঁধন বেশী শক্ত হয়। তা ছাড়া মৌচাকের ক্ষেত্রে জায়গা বেশী হওয়া, ও এ ধরনের অন্য প্রশ্নও আছে।

মাকড়শার জালটা অনেক সময় একেবারে সঠিক ছ' কোনা হয় না। আটকোনা, পাঁচকোনা, একটা বাহু বড়, একটা বাহু ছোট, এ রকমও হয়ে যায়। এর কারণ হল, যে জায়গায় জালটা বুনছে সেখানের সুবিধা অসুবিধাটা। কিন্তু বাইরের জ্যামিতির একটু ইতর বিশেষেও জালের ভিতরের বোনাটা একরকমই হয় ও তাতে কোন ত্রুটি থাকে না। আতে কতকগুলি সমান্তরাল টানা দেয়া থাকে। এতেও কোন ভুল থাকে না।

এবার আমার নিজে হাতে করা কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলি। মাকড়শার জালের কোন কোন অংশ নষ্ট করে দিলে মাকড়শা কি করে, তা দেখবার জন্য আমি একটি ছোট কাঁচি দিয়ে মাকড়শার তৈরি করা জালের একটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। এটা অবশ্য খুব সহজ হয় না, কারণ মাকড়শার জালে একটু আঠালো ভাব আছে। যে কোন জিনিসই যেন একটু লেগে লেগে যায়। তাই কাঁচি, পিন কি অন্য কিছু দিয়েও অংশবিশেষ বাদ দেয়া সহজ হয় না।
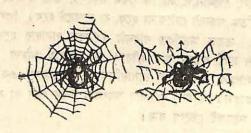
যাই হক, ওইরকম মাকড়শার জালের অংশবিশেষ বাদ দিলে দেখা যায়, যে মাকড়শা জালের ঠিক মাঝখানে বসে, তার প্রতিটি তন্তুর টানের কমবেশী থেকেই বুঝতে পারে কোথায় জালের ক্ষতি হয়েছে। তারপর যেখানে ছিঁড়ছে, তখনি সেইখানে এসে জালটা ঠিক যেমন ছিল, তেমনি করেই সেটাকে মেরামত করে ফেলে। এই মেরামত একেবারে বেমালুম।

এই পরীক্ষার পর, আর একটি পরীক্ষা করলাম। যখন মাকড়শাটা মেরামতের কাজ করছে তখন তার উপর অনেকটা দূর থেকে-যাতে তাপ না

লাগে এই ভাবে সিগারেটের ধোঁয়া দিলাম। শুধু ধোঁয়া দেবার জন্য সিগারেটের বিকল্প হিসাবে দেয়া হল ধূপের ধোঁয়া। সিগারেটের ধোঁয়ায় দেখা গেল যে মাকড়শাটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর জালটাকে মেরামত করবার সময় দেখা গেল যে জালটা আর ঠিকভাবে বুনতে পারছে না। সেই জায়গায় ধূপের ধোঁয়ার ফলটা অনেক কম। সেটাকে সিগারেটের ধোঁয়ার তুলনায় নগণ্য বলতে হয়। অবশ্য ধূপের ধোঁয়া, খুব সুগন্ধী ধূপের হলেও যে মাকড়শারা তা পছন্দ করে, এ কথা বলা যাবে না। এমনকি এও দেখেছি যে জালটার কোনরকম ক্ষতি না করেও ধোঁয়া দিলে মাকড়শাটা জালের মাঝখান থেকে বার হয়ে জালের এক ধারে আসে ও এসে যেন লক্ষ্য করতে থাকে জালের কোন ক্ষতি হয়েছে কি না। কীট পতঙ্গদের মধ্যে অনেকেই গন্ধ সম্পর্কে আমাদের তুলনায় বহুগুণ সজাগ। এ নিয়ে বহু গবেষণাও হয়েছে।

শুধু ধোঁয়ার যে পরীক্ষার কথা বললাম, তাতেও দেখেছি যে সিগারেটের ধোঁয়াতে নিকোটিন থাকাতে মাকড়শারা কাঁপতে সুরু করে, বেশী দিলে অসুস্থও হয়ে পড়ে। তাই সিগারেটের বাক্সতে আজকাল যে লেখা থাকে যে "ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর," এটা আমাদের মনে রাখা দরকার।

ধূপের বা সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ যে কীটপতঙ্গদের বিভ্রান্ত করতে পারে, এটাও পরীক্ষা করে দেখেছি। পিঁপড়েরা যখন যাতায়াত করে, তখন তা করে এক লাইনে। আর এই একই পথে তাদের যাওয়া যেমন, আর তেমনি আসাও। যারা আসছে ও যারা যাচ্ছে তার মুখোমুখী হবামাত্র একটা আর একটার মুখে যেন মুখ ঠেকিয়ে চলে যায়। এরই মধ্যে দিয়ে গন্ধ, খাদ্য, এ সবের একটু বিনিময়ও ঘটে। এইরকমের দেয়া নেয়ার মধ্যে দিয়েই ওরা পথ চিনে ঠিক রাস্তায় যায়। আমাদের যেমন রাস্তার ম্যাপটা আসলে কথারই ছবি; সেই জায়গায় ওদের ম্যাপটা হল গন্ধের ম্যাপ। এ ম্যাপটা আবার বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওদের পথের উপরেই থাকে, তাই কাছাকাছি একবার এসে গেলে চিনে যেতে অসুবিধা হয় না।

আমি যে পরীক্ষাগুলি করেছিলাম, তাতে একদল পিঁপড়ের যাতায়াতের রাস্তার উপরে সিগারেট বা ধূপের ধোঁয়া ঢেলে, সেই পথের গন্ধের ম্যাপটা যেন ঢেকে দিলাম। দেখা গেল, পিঁপড়েরা সেই জায়গা পর্যন্ত এসে, আর যেন পথ খুঁজে না পেয়ে, তাদের পথের নির্দিষ্ট লাইনের বাইরে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর হয়ত আবার পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টা বাদে, সিগারেটের গন্ধটা দূর হলে সেই পথে যাতায়াত সুরু হয়।

দুটো জিনিস এই পরীক্ষায় লক্ষ্য করেছি। তবে খুব বেশী সংখ্যায় পরীক্ষা করা হয় নি বলে একটু সাবধানে বলছি। পথটা যখন আবার চালু হয়ে গেল, তখন যেন যেখানে ধোঁয়াটা লেগে ছিল, সেইখানটা একটু ঘুরে যেন নতুন পথটা তৈরি হয়। আর যে দুচারটি পিঁপড়ে প্রথমেই পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিল, তারা যেন আর পথে কিছুতেই ফিরতে না পেরে, শুধু এলোমেলো ঘুরতেই থাকে।

২৪

আকাশ আমায় ডাকে দুরের পানে

মাত্র অল্পদিন আগে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে, এইরকম কচি একটা বকের বাচ্চা আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতে কোথা থেকে এসেছিল। বক পুষতে বড় একটা দেখা যায় না। তাই পোষার জন্য একটা বক এলো বলে, ওঁদের বাড়ীতে তো বটেই, এমনকি আমাদের বাড়ীতেও যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। ওঁরাও বকটাকে কোন খাঁচাতে বন্ধ না করে, বা কোন জায়গায় আটকে না রেখে, ছেড়েই রেখেছিলেন। তাই সেটা সারা বাড়ি, এ ঘর, ওঘর, ছাদ সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত। আবার দেখতাম, একা একা না বেড়িয়ে, কারো পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে চাইত বকটা। বলা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরবার জন্য একজন না একজন কেউ তার চাই।

জগৎবিখ্যাত আচরণতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ডাঃ কনরাড লরেন্স প্রাণী আচরণের এইদিকটি নিয়ে প্রচুর চর্চা করেছেন। একে তিনি বলেছেন ইমপ্রিন্টিং বা চিত্র-সংবেশ। বাংলা প্রতিশব্দটি বিশেষজ্ঞদের সামনে পেশ করলাম, তাঁদের বিচারের আশায়। হয়ত চিত্র-সংবেশ না বলে মনে বা স্নায়ুতে ছাপপড়া বললে ব্যাপারটা বেশী বোঝা যায়। যাই হোক কনরাড লরেন্সের ইমপ্রিন্টিং কি তাই বলি।

লরেন্স দেখিয়েছেন যে ডিম ফুটে পাতিহাঁসের বাচ্চা হবার সঙ্গে সঙ্গে, বাচ্চাগুলো তাদের মার পিছু পিছু সর্বদা চলা ফেরা করতে থাকে। যদি মাকে সরিয়ে নিয়ে, তার বদলে অন্য একটা পাখী সেই জায়গা নেয়, তা হলে বাচ্চাগুলো সেই পাখীটারই পিছু পিছু একইরকম ভাবে চলাফেরা করতে থাকে। এমনকি পাখীর বদলে মানুষ হলেও তার পিছু পিছুও ওই একই রকমভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই অভ্যাসটা একবার হয়ে গেলে, তখন সেই প্রাণীটিই যেন ওদের মার জায়গা দখল করে নেয়। এই সময়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে তাদের নিজের মা ফিরে এলেও, আর তারা মায়ের সঙ্গে না গিয়ে, যার সঙ্গে যেতে অভ্যস্ত হয়েছে তার সঙ্গে যায়। একেই লরেন্স বলছেন স্নায়ুতে ছাপ পড়া—ইমপ্রিন্টিং।

হাঁস, মুরগী বা ওইরকম পাখীদের কি করে খুঁটে খেতে হবে, বা কি জিনিস খুঁটে খেতে হবে, তাও মা বা মা'র জায়গায় যে, তার দেখে দেখেই শেখে। যেমন বকের বাচ্চা, যখন তাদের মার পিছন পিছন ঘোরে, তখন তাদের মা'র মাছি, পোকামাকড় কি কোন জলাতে মাছ ধরে খাওয়া দেখে, তাই শিখে যায়। কিন্তু এই বকটা তো ঘোরাফেরা করতে শিখল মানুষের সঙ্গে। তাই ওতো পোকামাকড় বা ওই ধরনের কিছুই খেতে শিখল না, সেই জায়গায় বরং শিখল দুধ খেতে, মাছ খেতে। ওই বাড়ীতে বকের বাচ্চাটাকে এইসবই খেতে শেখানো হল।

এমনি করে বকের বাচ্চাটা কয়েক মাসে বেশ বড় হয়ে উঠল। আমার প্রায়ই মনে হত, যে ওর নিজের ডানাদুটোতে উড়ে যাবার মত জোর হলেই বোধ হয় ও পালাবে কিন্তু পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের মত ছিল এর ঠিক উল্টো। তিনি বলতেন, যে কিছুতেই ও মানুষের সঙ্গ ছাড়বে না, সে আবার পালাবে ? কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "চন্দ্রনাথ" বইয়ের সেই কটি লাইন ঘেঁসা, যেখানে হরিণশিশু রাজা ভরতের সব বাঁধন কাটিয়ে চলে গেল, সেইখানের লাইনগুলো,

"তারপর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া সে আজন্ম মায়াবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া গেল,—বনের পশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না।"

কিন্তু মানুষের ব্যথার কথা ছাড়াও পায়রার উপরে গ্রোমানের একটি পরীক্ষার কথা বলতে হয়। গ্রোমান পায়রার বাচ্চাগুলোকে একটা সরু টিউবে বড় করে তুললেন, যাতে তারা ডানাগুলো চালাতেই না পারে। কিন্তু পরে ছেড়ে দিতে দেখা গেল, তাদের ওড়ার ক্ষমতা একেবারে স্বাভাবিক ও জন্মগত। দেখা গেল যে এদের ওড়বার ক্ষমতা ও স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা পায়রার ক্ষমতার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নেই। এতে যেন সেই কথা বলা যায়, যে পাখী ওড়ে, আকাশের হাতছানি তাকে টানবেই। বাড়ীর লোকেদের পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু যেন গাঢ় নীল চোখে ওই বকটার এমন গভীর দৃষ্টি, যে তা দেখে আমার মনে হত যেন এই ছোট্ট ঘরের পরিবেশে ওকে মানায় না।

বকের বাচ্চাটা যখন ওদের বাড়ীতে এসেছিল সেটা গ্রীষ্মকাল। বকটা বড় হয়ে উঠতে লাগল, আর এদিক গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা আসার সময় হয়ে এলো। সুরু হল আকাশে ঘন মেঘের আনাগোনা। ছাদে যখন বকটা ঘুরে বেড়াত, তখন বর্ষার হাওয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ওকে একটু ভিন্ন

রকমের মনে হতে লাগল। অবশ্য এটা শুধু বোধ হয় ছিল আমারই মনোভাব। আর সকলেই মনে করতেন যে বকটা সবাইকে এত ভালবাসে যখন, তখন, কি আর ছেড়ে যেতে পারবে ?

তারপর যখন বর্ষাটা ভাল করে সুরু হয়েছে, সেই সময়ে একদিন হঠাৎ বাড়ীর লোকেরা দেখে বকটা আর নেই। কোথায় গেল ? এ ঘর, ওঘর, ছাদ, পাশের কোথাও সে নেই। বাড়ীর লোকেরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন যে বকটা খাওয়া দাওয়া করবে কি করে ? কারণ যে ধরণের খাওয়া দাওয়াতে সে অভ্যস্ত ছিল তা কি করে জুটবে ওই নতুন জীবনে ?

আমার মনের প্রশ্নটা ছিল একটু ভিন্ন, লরেন্সের সেই ছাপ পড়া বা ইম্প্রিন্ট সম্পর্কে। প্রশ্নটা হল এই ঃ এই বকটির স্নায়ুতে যাদের বাড়ীতে সে বড় হয়ে উঠেছে, সেই মানুষগুলির ছাপই তো থাকবে। তা হলে কি করে এই আকাশ ও আকাশের মেঘ সঞ্চার ওকে এমন করে টানল, যে ও ঘর ছেড়ে সেই অজানার দিকে পাড়ি দিল ? বহুদিন আমি এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছি। তারপর শেষ পর্যন্ত কনরাড লরেন্সের আবিষ্কারের মধ্যেই এর উত্তর যেন খুঁজে পেলাম।

আমার উত্তরটি হল এই ঃ যেমন শিশুপ্রাণীর স্নায়ুতে তার নিজের মা, কি যার কাছে সে বড় হয়ে উঠছে, এদের ছাপ পড়ে; তেমনিই তো আকাশ, বাতাস, আলোয় ভরা পরিবেশ এরও তো ছাপ পড়ে। বরং সে ছাপ হাজার হাজার বছর বংশানুক্রমে পড়ে হয়ত তা জিনের সঙ্গে মিশে বংশানুক্রমণের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাই এ বাড়ী থেকে বিদায় নিলে খাওয়া এত সহজ মিলবে কি না মিলবে, তার দিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে আকাশ আর মেঘের ডাকে সে চলে গেল। তবে কি বলব বর্ষা আর বর্ষার মেঘকে বক বেশী ভালবাসে, তার ঘর আর নিশ্চিত খাদ্যের চেয়ে ?

এ সম্পর্কেও আমার কিছু বলার আছে। বকের সব চেয়ে বড় খাদ্য হল পতঙ্গ আর মাছ। বর্ষার জলেই এদের জন্ম ও বৃদ্ধি। শুধু জন্মানো বলি কেন ? বর্ষা এদের জীবনযাত্রার ধারক। তাই হয়ত বর্ষার হাতছানি এমন করেই ওকে টেনে ছিল।

২৫

যার ছেলে যত চায়

চাইবার মত করে চাইলে তবেই নাকি পাওয়া যায়। জানি না এই জন্যই কি না, ভ্রূণ অবস্থা থেকে পাখীর হাঁ'গুলো, ঠোঁট ও মুখ সারা শরীরের অনুপাতে অনেকটা বড় আকারের। অবশ্য নতুন জন্মেছে, এ রকম মানব-শিশুরও মাথা শরীরের অনুপাতে অনেকটা বড় হয়। তবু কিন্তু ডিম থেকে সদ্য জন্মানো পাখীর ছানা দেখলে যেমন মনে হয় যে সারা শরীরটা একটা মস্তবড় হাঁ, মানব শিশুর মুখ বা মাথা দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।

নতুন জন্মানো পাখীর ছানার না থাকে পালক, না থাকে ওড়বার মত ডানা। তাই যতদিন না এ সবগুলো গজিয়ে উঠছে, ততদিন পাখীর ছানাকে, তাদের মা বাবা ঠোঁটে করে এনে, বাচ্চাদের মুখের ভিতরে খাবার দেয়। দেয়া খাবারের উপরেই এদের নির্ভর করতে হয়। হাঁ-টা বড় আর উঁচু হলে, দূর থেকে উড়ে বাসায় আসার সময়েই মা ও বাবা পাখী তা দেখতে পাবে; আর সেই বড় হাঁয়েই প্রথম খাবারটা পড়বে। পাখীর ছানাগুলোর তাই এমনই অভ্যাস হয়ে যায়, যে কোন শব্দ পেলে, কি বাসার কাছে কিছু একটা দেখতে পেলেই ওরা হাঁ করবে। টিম্বারজেন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বাসার কাছে আঙ্গুল, কি একটা কাঠি নিয়ে এলেও পাখীর ছানারা হাঁ করে। যদি দুটো জিনিস দেখানো হয়, তবে যেটা মোটা ও কাছে, তার দিকেই ওরা হাঁ-টাকে বাড়ায়।

আমাদের দেশে কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময়ে আবার চেষ্টা করে কাকের যতগুলো সম্ভব ডিম, ফেলে দিতে। এর মানেটা হল, যে তা হলে কোকিলছানাই বেশী যত্ন পাবে। এ ছাড়াও পরভোজী ও পরজীবী বলে, প্রকৃতি বোধ হয় এদের হাঁ-টাও বড় হতে সাহায্য করেছে; যাতে তারা মা কাকের কাছে বেশী খাদ্য পায়। কাকেদের নিজের বাচ্চাদের হাঁ ছোট বলে, কোকিলের ছানার তুলনায় কম খেতে পেয়ে, নিজেদের বাসাতেই যেন তারা পরবাসী হয়ে থাকে। তবু এর মধ্যেই কাকের ছানা আর কোকিলের ছানা দুই বড় হয়ে ওঠে।

পাখীরা, সব পাখীরা না হলেও কিছু পাখী, তারা নিজেরা যে খাদ্য খাচ্ছে, বাচ্চাদের তা না দিয়ে, একটু নরম ও পাতলা করা খাদ্যই তাদের খেতে দেয়। পায়রা জাতের পাখীরাই এটা করে। কি করে এটা করে, তাই বলি। পায়রাদের ঠোঁট আর মুখের তলায়, গলাতে একটা জায়গা আছে খাদ্যনালীর একটা অংশ, যাকে বলে গিজার্ড, এর চারিদিকের মাংসপেশীটা অনেকটা শক্ত। পায়রারা ছোলাই হোক, ধান, গম যা পায়, আস্ত অবস্থায় খেয়ে নেয়। সেগুলো যখন গিজার্ডে জমা হয়, সেইখানে মাংসপেশীর চাপে, চিবিয়ে পাতলা ও ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ হয়ে যায়। গিজার্ড থেকে বাচ্চাকে খাওয়াতে বার করা খাবারের একটা অংশ মাটিতে পড়ে যাওয়াতে আমি সেটা পরীক্ষা করতে পেরেছিলাম। দেখি সেটা অনেকটা সিদ্ধ হওয়া ডালের মত নরম ও পাতলা।

এ ছাড়াও পায়রারা তাদের বাচ্চাদের গিজার্ডের চারিদিকে যে কোষগুলি আছে, তা থেকে বার করা রসও দেয়, একে বলে পিজিয়ন মিল্ক বা পায়রার দুধ।

যে সব পাখীরা পোকামাকড় খায়, তাদের মা বাবারা আস্ত পোকাই তাদের খেতে দেয়। তাদের আর আধ হজম করা খাবার দিতে হয় না। যে সব পাখী শিকারী, যেমন বাজ, তাদের বাচ্চারা অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েই জন্মায়। এদের বেশী যত্ন করতে হয় না। কাক বাচ্চাদের খুব যত্ন করে। এদের স্ত্রী পুরুষের জোড়া, মানুষের মত সারা জীবনের মতন। আর এরা বাঁচেও অনেকদিন কুড়ি-তিরিশ বছর। জোড়ের একটা মরে গেলে সাধারণতঃ আর জোড় বাঁধে না। কাকের জ্বালাতনে যতই আমরা বিপন্ন ও বিপর্যস্ত বোধ করি না কেন, কাকেদের নিজেদের অনেক গুণ আছে। যেমন সারা জীবনের জোড় বাঁধা, একটা কাক কোন বিপদে পড়লে, পুরো কাক সম্প্রদায় তাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসে, সকলে মিলে একসঙ্গে কা কা করতে থাকে।

কাকের মত অনেক পশু, অনেক পাখী, অনেক প্রাণীই ডিম পাড়া, ও বাচ্চা হবার সময়েই বাসা করে। বাসা করা, ডিম পাড়া, ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো, তারপর বাচ্চাদের প্রয়োজনে তাদের খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তোলা, এ সবই একটা কাজের অর্থাৎ প্রজাতি সংরক্ষণের মধ্যেই পড়ে। জীবনেরও দুটি কাজ। একটি নিজেকে বাঁচানো, আর একটি প্রজাতিকে বাঁচানো। প্রাণীর গড়নটাই এমন হতে হয়, যাতে এই দুটি কাজ খুব ভালভাবে চলতে পারে। গড়ন বলতে শুধু বাইরেটাই বোঝায় না; শরীরের মধ্যেকার যে সব

গ্রন্থি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ, হরমোন ঢেলে দেয়, তা শুদ্ধ বোঝায়। পুরুষ ও স্ত্রী গ্রন্থির কয়েকটি হরমোনের প্রভাবেই বাসা করার প্রবৃত্তি থেকে সুরু করে, বাচ্চা প্রতিপালনের প্রবৃত্তি হয়। স্ত্রী হরমোনগুলি ইস্ট্রোজেন, প্রজেষ্টোজেন; আর পুরুষ হরমোন হল, এন্ড্রোজেন।

ষ্টিকলব্যাক নামে এক ধরনের মাছের উপর টিম্বারজেন এই হরমোনের প্রভাবের অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। পুরুষ গ্রন্থির প্রভাবে এই মাছের পুরুষরা বালি স্তূপাকার করে জড়ো করে, তার ভিতরে একটি গর্ত করে। তারপর স্ত্রী মাছকে নিজের নাচের ভঙ্গীতে মুগ্ধ করে সেই গর্তে ডিম ছাড়তে প্রভাবান্বিত করে ও সেইখানেই পুরুষ শুক্র ছাড়ে। ফোটা ডিম, যথেষ্ট অক্সিজেন না পেলে বাঁচবে না। তাই পুরুষ ষ্টিকলব্যাক সেই জায়গায়, সর্বদা উপস্থিত থেকে নিজের ডানা চালিয়ে সেখানে অক্সিজেন যোগান দেয়। এ সবই ষ্টিকলব্যাক করে তার হর্মোনের প্রভাবে। হরমোনের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করলে, পুরুষ ষ্টিকলব্যাকের এ ক্ষমতা চলে যায়।

প্রকৃতির রাজত্বে এমন এমন নিয়ম যে পশু পাখীদের মধ্যে যাদের অনেক বাচ্চা হয়, তারা বাচ্চার যত্ন কম করে বা করে না। আর যাদের বাচ্চা কম, তাদের যত্ন বেশী। যেমন কড মাছের একবারে ন'লক্ষ বাচ্চা জন্মায়। বাচ্চাদের তারা কোন যত্নই নেয় না। এর ফলে বেশ কিছু বাচ্চা মরে গেলেও, এত বেঁচে থাকে যে, বংশ বজায় থাকে তাতেই। সেই জায়গায় স্যালমন মাছের একবারে হাজার পাঁচেক বাচ্চা হয়। এরা কিছু যত্ন নেয়। ডিমগুলো বালি বা পাঁকের মধ্যে গুঁজে রাখে। ষ্টিকলব্যাকের বাচ্চা হয় আরো কম, একবারে ষাটের বেশী নয়। আর এরা যে কত যত্ন নিয়ে বাচ্চা ফোটায়, তা তো আমরা উপরের আলোচনায় দেখলাম।

তবে একটা কথা ঠিক, কোন প্রাণীর সমাজ সংগঠনের বিবর্তন হতে গেলে, তার সুরু হয় দু' জায়গায় ঃ খাদ্য সংগ্রহে আর সন্তানপালনে।

২৬

ওদের কম্পাস

একটিমাত্র পিঁপড়েকে নিয়েই ঘটনা। আগে ঘটনাটা বলি। আমাদের দোতলার বারান্দার রেলিংয়ের উপর দিয়ে সার বেঁধে কয়েকটা কালো ডেও পিঁপড়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটাকে আমি টুসকি মেরে ফেলে দিলাম। ঘুরতে ঘুরতে সেটা ফুট পনেরো নিচে রাস্তার উপরে গিয়ে পড়ল। পিঁপড়েগুলো যাচ্ছিল পূব থেকে পশ্চিমে। টুসকি লেগে এতটা ঘুরতে ঘুরতে যে সেটা রাস্তায় গিয়ে পড়ল, তবু কিন্তু ওর গতিটা একমুখীই রয়ে গেল ঃ সেই পূব থেকে পশ্চিম। কেন ?

যদিও শুধু একটা কেনই বললাম, তবু এই প্রসঙ্গে আমার মনে অনেক-গুলো কেনই উত্তর খুঁজে উঁকি মারতে লাগল। তারই আলোচনা করি।

অতটুকু একটা ডেঁও পিঁপড়ে ঃ সজোরে একটা টুসকির ঘা খেয়ে, পনেরো ফুট উঁচু থেকে পড়লো। তবু তার কিছুই হল না; এমনকি দিক ভ্রম পর্যন্ত হল না কেন ? দিক ভ্রমের কথায় পরে আসছি। অন্য দিকটা বলি আগে। খুব ছোট, আর সেই সেই অনুপাতে হাল্কা বলেই, টুসকিতে অত উঁচু থেকে পড়ায় ওর না হোল কোন ক্ষতি। অথচ পিঁপড়েটা যদি হাতীর সাইজের হত, তা হোলে এ পড়ায় ওটা একেবারে থেঁৎলে যেত। কোন বস্তুর আয়তন ও ওজন যত বেশী হবে, মাধ্যাকর্ষনের শক্তিও তার উপরে তত বেশী হবে। সেই শক্তিতে নিজের ভারী দেহটা নিয়ে, বেশ খানিকটা উঁচু থেকে পড়লে, বলাই বাহুল্য তার দেহটা থেৎলে যাবে। প্রকৃতির সামঞ্জস্যও কি অদ্ভুত যে, পতঙ্গদের ক্ষেত্রে তাদের শরীরটা বেশ ছোটই। বড় হলেই নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিত।

গুবরে পোকা পতঙ্গদের মধ্যে একটু বড় সাইজের। এর একটা সমস্যা তো আমরা যখন তখনই দেখতে পাই, যে যদি এ পোকা যদি উল্টো হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তা হলে আর সহজে উঠতে পারে না। অথচ এর সাইজ যদি আরো ছোট হত, তা হলে এ সমস্যাই আর দেখা দিত না।

ঠিক অনুরূপ কারণে আমার আঙ্গুলের টুসকির ধাক্কাতেও পিঁপড়েটা জখম হল না। এখানেও সেই পিঁপড়েটার শরীরের ওজন কম হওয়ার ব্যাপার। বোঝবার জন্য দুজন মুষ্টিযোদ্ধাকে ধরা যাক। যে ঘুঁসি খাচ্ছে, সে যদি শোলা দিয়ে তৈরি হত, তা হলে সে ঘুঁসির ধাক্কায় উড়ে যেত বটে, কিন্তু আঘাতটা বিশেষ লাগত না।

এখন সব থেকে জটিল প্রশ্ন, এত উঁচু থেকে ঘুরপাক খেয়ে পড়া সত্ত্বেও সেই পূর্বদিক থেকে, পশ্চিমে চলাটা কিন্তু ঠিকই রইল, এটা কি করে সম্ভব হল ? এ কথা বলতে হলে পিঁপড়ের দিক নির্ণয় ক্ষমতা সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা একটু আলোচনা করা দরকার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একজন ইতালীয় জীববিজ্ঞানী, সাঁন্‌চি পিঁপড়েদের প্রায় মৌমাছির মতনই দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। যাতে সূর্যের আলো সোজাসুজি দেখতে না পায়, সে ব্যবস্থা করে পরীক্ষা করাতে দেখা গেল, যে তবু ওরা দিক ভ্রষ্ট হচ্ছে না। তখন মনে করা হল যে হয়ত সৌর চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে কি না ? ১৯৬৪ সালে জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী ডাঃ রাইমান দেখালেন যে মেঘে ঢাকা সূর্যালোক, যাকে পোলারাইজড বা সমবর্তিত আলো বলা যায়, সেই আলোতেও সূর্যকে চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে পিঁপড়েরা দিক নির্ণয় করতে পারে। প্রচুর পরীক্ষা করে রাইমান দেখালেন যে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও, মৌমাছিরা যেমন সূর্য কোন দিগন্তের কত ডিগ্রী উপরে, তার উপরে দিক নির্ণয় করে, পিঁপড়েরাও ঠিক তাই পাবে।

কিন্তু দিক নির্ণয়ের এইটাই একমাত্র পথ নয়। পিঁপড়েরা চলাচলের সময় গন্ধ বা ফেরোমনের যে পথ রেখে যায়, অন্য পিঁপড়েরা তাই ধরে যাতায়াত করে। এই গন্ধপথ এদের এত নিশ্চিত যে উগ্র সেন্ট কি নিকোটিনের গন্ধে এদের কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত করা যায়; কিন্তু একটু পরেই তার প্রভাব অতিক্রম করে, ঠিক পথ ধরে নেয়। টুসকি খাওয়া পিঁপড়েটা ঠিক পথ ধরতে পারল না বটে, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো ফিট নিচের একটা পথ ধরলে বটে, কিন্তু পূব থেকে পশ্চিমে চলাটা ঠিকই রইল। এটা যে কাক-তালীয় নয়, সেটা দেখতে এইরকম পরীক্ষা একাধিকবার করে একই ফল পেয়েছি।

পিঁপড়ের মতন একটা এতটুকু প্রাণী, তার পক্ষে অসীম একটা পরিবেশে, কি করে যে দিক ঠিক রাখে, সেটা পরম আশ্চর্য। কিন্তু এই

ধরনের গতায়াত প্রজাপতি বা অন্য প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। যাযাবর পাখীরা যেমন একদেশ থেকে অন্য দেশে হাজার হাজার মাইল পথ পার হয়ে যাতায়াত করে, তেমনি বিশেষ জাতের প্রজাপতি আছে, যারা উত্তর আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল থেকে, ভূমধ্যসাগর পার হয়ে স্পেন, জার্মানী, এমনকি ইংলিশচ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যায় ও আবার ফিরে আসে। এই জাতের প্রজাপতির নাম হল পেন্টেড লেডি।
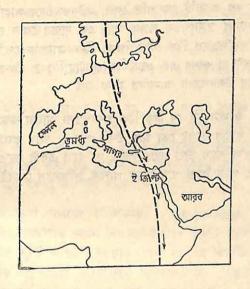
এই জাতের প্রজাপতিদের জন্ম হবামাত্র সাহারার উত্তরাঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি উত্তর দিকে উড়ে যায়। যেতে যেতে ওরা ভূমধ্যসাগরে এসে পৌঁছয়। এত টুকুটুকু প্রজাপতি কি করে ভূমধ্যসাগর পার হয়, সেটা একটা রহস্য। কিন্তু রহস্য যাই থাক, এই দীর্ঘ সমুদ্র যে তারা পার হয়ে যায়, এ কথা সত্য। তারপর সোজা উত্তরে যেতে যেতে ওরা ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত চলে যায়। উত্তর ইউরোপে আবার ওদের বাচ্চা হয়। এই বাচ্চারা আবার উড়তে থাকে দক্ষিণ অভিমুখে। এরাও উত্তর সাহারা অঞ্চলে এসে হাজির হয় ভূমধ্যসাগর পার হয়ে। এমনি ভাবে বছরে দুবার করে এদের বাচ্চা হয়, একবার উত্তর সাহারায়, আর একবার উত্তর ইউরোপে। আর এদের বছরে দুবার করে ভূমধ্যসাগর পার হওয়া। এদের এই দীর্ঘ যাত্রা দু হাজার মাইলের বেশী।

কত সংখ্যায় প্রজাপতি যে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, তা বলা শক্ত। এই জাতের প্রজাপতি, যাদের বলে পেন্টেড লেডি, এদের এক একটি দলে কত থাকে, তারও সংখ্যা নির্ধারণ করে দেখা গেছে যে এদের তিনশো কোটি। তার মানে দু' তিনশো কোটি প্রজাপতি বছরে দুবার করে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে যাতায়াত করছে। একটি বিশেষ নির্দিষ্ট রাস্তায় নির্ভুলভাবে ওরা যাচ্ছে আসছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল কি করে ? ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় দেখা গেছে, ঘণ্টায় প্রায় ছ' মাইল গতিতে, একঘণ্টায় দশ বারোটি প্রজাপতি গেল, এইরকমভাবে সারাদিন রাত চলতে থাকে। একদল প্রজাপতির সঙ্গে আর এক দলের কোন যোগাযোগ নেই, তবু ওরা নির্ভুলভাবে ঠিক পথে গিয়ে, ঠিক জায়গায় পোঁছচ্ছে কি করে ? আর কেনই বা ওদের এই ওড়াউড়ি (ছোটাছুটি) ? এ প্রশ্নগুলো আছে। কিন্তু এর উত্তরগুলো আমাদের জানা নেই।

সময় সময় এ ও মনে হয়, যে ঠিক ঠিক প্রশ্নগুলো আমরা করতে পারছি তো ? ঠিক প্রশ্ন করলে তবেই তো ঠিক উত্তর পাব ! আর প্রজাপতি যদি হাজার মাইল নির্ভুল ভাবে উড়ে যেতে পারে, তা হলে একটা ডেঁও পিঁপড়ে পনেরো ফুট নিচে পড়ে গিয়ে পূব থেকে পশ্চিম অভিমুখে যেতেই কি ভুলে যাবে ?

২৭

স্বজনপ্রীতি ও পোষণ

শুনেছি স্বদেশী যুগে রাখিবন্ধন উৎসবের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথই ঠিক করে দিয়েছিলেন, "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।" মানুষের কাছে ভাই, বোন, আত্মীয়, স্বজন এদের কি মূল্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ থেকে একটা প্রশ্ন ওঠে, প্রাণীদের মধ্যে কি স্বজনবোধ আছে ?

বাচ্চা জন্মাবার আগে থেকেই বহু প্রাণী বাচ্চার থাকার জায়গা, কি পরে কি খাবে, তার ব্যবস্থা করে রাখে। তা ছাড়া বাচ্চা যতদিন নিজেরটা নিজে করে নিতে না পারছে, ততদিন তাদের দেখাশোনা করে যায়। কিন্তু তার পরে ? প্রাণীদের মধ্যে বড় হয়ে যাওয়া সন্তানদেরও মা বাবা, কি অন্য ভাই বোনেদের মধ্যে কোন আকর্ষণ থাকে কি ?

১৯৬৪ সালে নেচারের (Nature) মত বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞান পত্রিকায় মেনার্ড স্মিথ, প্রাণীদের স্বজন নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেখা যায় যে সামাজিক পতঙ্গ, যেমন মৌমাছি কি পিঁপড়েরা বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে যেন একটা সংযম দেখায়। কারণ, দেখা যায় যে বাচ্চা হলেই তো তাদের দেখাশোনা, খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তোলা, ইত্যাদি হাজার ঝামেলা। এ ঝামেলা পোয়াতে গিয়ে প্রাণীদের আয়ুও যে কমে যাচ্ছে, এও টেবার ও দাসম্যানের মত বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন।

তবু সমস্ত প্রাণীকেই সন্তান উৎপাদন করতেই হবে। কারণ বিবর্তন হতে গেলেই, সন্তান না থাকলে সেটা হবে কাদের উপর ? আগের প্রজন্মের জিনগুলোর মধ্যে যদি কোন রদবদল করতে হয়, তার একমাত্র রাস্তাই হল, সন্তান উৎপাদন। সন্তান তার প্রজাতিগত জিনের একপ্রস্থ পাচ্ছে বাবার কাছে, আর এক প্রস্থ মার কাছে। এর মধ্যেও আবার হয় এটি, নয় ওটি সে দেবে নিজের সন্তানদের। ফলে প্রকৃতির হাতে প্রজাতিগত উপযুক্ততার বাছাই কতকটা হচ্ছে। আর এইরকম করেই বিবর্তন হয়।

তা হলে বিবর্তনের দিক থেকে স্বজন বাছাই করার প্রয়োজনটা কোথায় ?

ঠিক ওই একই জায়গায়। মা, বাবার কাছ থেকে পাওয়া জিনগুলোকে বাঁচানো, যাতে ভবিষৎ অগ্রগতি না থেমে যায়। অবশ্য এর মধ্যে যদি কোন জিন উপযুক্ত না হয়, তা হলে তা প্রকৃতির নির্বাচনে বাতিল হয়ে যাবে

স্বজন বাছাইয়ের দিক থেকে মৌমাছি কি পিঁপড়ে এদের ধরা যাক। এদের মধ্যে শ্রমিক যারা, তারা জিনগত ভাবে স্ত্রী হলেও, এদের বাচ্চা হবার ক্ষমতা নেই। স্ত্রী হিসাবে সে ক্ষমতা থাকে রাণীর, আর থাকে অন্য পুরুষদের। রাণী মৌমাছির যত বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছে, তাদের খাবার জন্য চাকে মধু আনা, তাদের পালন করা, চাক বানানো কি মেরামত; এ সবই করছে তারা কেন ? কারণ হল তাদেরই সমান জিন নিয়ে তাদেরই ভাই বা বোনদের বাঁচাতে। তলিয়ে না দেখলে এটাকে সামাজিক পরার্থপরতা বলেই মনে হবে, কিন্তু উপরে যা বলেছি, তা থেকেই বোঝা যাবে যে এটা তা নয়। হ্যামিলটনের একটি কাজ থেকে দেখা গেছে, যে শ্রমিক মৌমাছিরা অন্য শ্রমিক মৌমাছিদের ঘর বড় করে। সেখানে পুরুষ মৌমাছির তুলনায় তেনগুণ মধু থাকে। তার কারণও হল যে শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ অনেক বেশী পাওয়া যাচ্ছে তারই জৈবিক পুরস্কার।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। যত ভাবনা চিন্তার কথা বললাম, প্রাণীরা এর কিছুই করে না। প্রকৃতিও বিবর্তনে শুধু যোগ্যতাকে নির্বাচন করেছে। এটাই হতে গিয়ে যা দাঁড়িয়েছে, তা বোঝবার জন্য আমাদের চিন্তা, যুক্তি. তর্ক সবই প্রয়োগ করতে হল। যাই হোক আবার স্বজন নির্বাচনের ব্যাপারে ফিরে আসি প্রাণীদের সব স্বপ্রণোদিত ভাবে।

অনেক বড় বড় প্রাণীর ক্ষেত্রে স্বজন নির্বাচনের ব্যাপারটা, হয়ত এতটা বেশী হতে পারে যে তাকে বর্তমান যুগের রাজনীতিতে যাকে স্বজনপোষণ বলে, সেই পর্যায়ের। সিংহের কথা বলি। দেখা যায় একটি সিংহ আর চার পাঁচটি সিংহী, একসঙ্গে থাকে। এক সঙ্গে শিকার করে, খায়, থাকে। সিংহের দল যাকে ইংরাজিতে প্রাইড (pride) বলে, তার মধ্যে সিংহ একটিই থাকে, আর বাকি সব সিংহী। দুটি সিংহ সহ-অবস্থানে এক জায়গায় থাকে না। এমন কি বাচ্চা হবার পরে সিংহ যখন বড় হয়ে যায়, তখন হয় তাকে অন্য জায়গায় চলে গিয়ে নতুন সিংহীদের খুঁজে নিয়ে নতুন দল গড়তে হয়, আর তা না হলে যে দলের মধ্যে জন্মেছে, সেই দলের সিংহকে হারিয়ে সেই দলের কর্তা হতে হয়।

এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন যেমন ডেভিড বারাস তাঁর বইয়ে

(Sociobiology and Behaviour) দেখিয়েছেন, পরিস্কার ফটোগ্রাফ শুদ্ধ দিয়ে, কি রকম ভাবে দুটি সিংহ, যারা মার পেটের দুই ভাই, একসঙ্গে এক জোট হয়ে লড়াই করে, আর একটা সিংহকে হারিয়ে, তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দলের যৌথ নেতৃত্ব নিলে। এ রকম দুজনের যুগ্ম নেতৃত্ব, তারা দুই ভাই বলেই নেয়া সম্ভব হল। কারণ ঠিক এই রকমের পরিস্থিতি ঘটলে দেখা গেছে, দুজন অনাত্মীয় সিংহ জোট বাঁধতে পারে নি। বরং দেখা গেছে তিনজনেই পরস্পরের সংগে লড়াই করেছে। তার পর, শেষপর্যন্ত যে জিতেছে, নেতা হয়েছে সেই।

এই রকমের "স্বজনপোষণ" শুধু যে সিংহের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তা নয়। জেব্রারাও, বিশেষ করে যারা পরস্পর ভাই বা বোন, আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পরস্পরকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। আচরণ বিজ্ঞানীদের মতে, ছোটবেলা থেকে মা, বাবা, ভাই, বোন, সবাইকে নিয়ে গোষ্ঠীবন্ধ হয়ে জেব্রারা থাকতে অভ্যস্ত বলেই তাদের এ গুণটা দেখা যায়। কিন্তু যে তৃণভোজী প্রাণীরা এ রকম গোষ্ঠীবন্ধ ভাবে বাস করতে অভ্যস্ত নয়, তাদের নীতি হল স্রেফ চাচা আপন বাঁচা
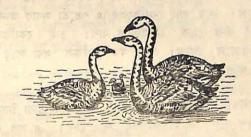
বেশ কিছু পাখীর মধ্যেও স্বজনবোধ দেখা যায়। এর মধ্যে রাজহাঁসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আমি পোষা রাজহাঁসের কথা বলছি না। রাজহাঁস, বা ওইরকম পাখীর উপর পরীক্ষা করেছেন অনেকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, রাজহাঁসরা জোট বেঁধে থাকে। এই জোটের মধ্যেই ডিম হয়, বাচ্চা হয়। যত্ন করে এই বাচ্চাদের এরা বড় করে তোলে। নিজেরা বড় হয়ে গেলে বাচ্চারা, সরে গিয়ে নিজেরা জোড়া বাঁধে। আবার তাদেরও বাচ্চা কাচ্চা হয়। কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলেও, এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত চলে না গিয়ে, কিম্বা জোড় বাঁধার ব্যাপারে সফল না হলে, ছোট ছোট

ভাই বোনদের প্রতিপালনের কাজই, মা-বাবার সঙ্গে মিলে মিশে করে। হিসেব করে, অঙ্ক কষে দেখা গেছে, নিজেদের বাচ্চা হবার চেয়ে, যদি দল বেঁধে কয়েকজনে মিলে সন্তান পালন করে, তা হলে বেশী সংখ্যায় সন্তান হয়ে, সমগ্র জিনগুলিকে রক্ষা করতে সাহায্য হয়।

এইটা অনেক প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। মুরগীর মধ্যে, যাদের মাদার হেন বলে, তাদের নিজেরা মা হবার চেয়ে, অন্যের বাচ্চা প্রতিপালন, তা দেয়া এ সবের সাহায্য করে। প্রকৃতির ইকোনমিকসে এটাই বেশী প্রয়োজন। সেখানে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির দাম বেশী।

মেনার্ড স্মিথের স্বজনবোধের এই থিয়োরি জীববিজ্ঞানে একটা আলোড়ন এনেছে। এ জন্য অনেকে নানান পরীক্ষা করেছেন। ১৯৭৫ সালে পাহাড়ী ব্লুবার্ডের উপর পাওয়ারের পরীক্ষার কথা বলছি। তিনি দশটি ক্ষেত্রে ডিম ফোটার পর, একেবারে অনাত্মীয় মা-বাবাকে বাসায় এনে বসালেন। দেখা গেল, একটি ক্ষেত্র ছাড়া কোন জায়গায় পালক মা বাপ বাচ্চাদের খাওয়াতে বিশেষ যত্ন নেয় না। এরই ব্যতিক্রম হিসাবে অনেকে কাকের কোকিলের বাচ্চা পালার কথা বলবেন, কিন্তু সেখানে কাক না জেনে এ সন্তানদের পালন করছে, যখনই জানতে পারল, তখনই একেবারে বিরূপ। কাক আর কোকিলের এ শত্রুতা সবার জানা। কোকিল দেখতে পেলেই কাক তাকে ঠোকরাতে যায়। তাই কোকিল ডাকাডাকি করে একটু আড়ালে থেকে। আর যত কোকিল ধরা পড়ে বেশীই তার কাকের তাড়া খাওয়া।

বিশেষ জাতের শেয়ালের মধ্যেও দেখা গেছে যে তারা নিজেদের মুখের খাবার বার করে দলের অন্য বাচ্চাদের খেতে দেয়। এ সব বাচ্চারা হয়ত তখন বেশ বড় বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই খাবার যোগাড় করে নিতে পারে, তবু এটা হতে দেখা যায়। এরা এক দলের, অবশ্য একেবারে বন্য বলে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কার সঙ্গে কার রক্তের সম্পর্কটা কতটা, তা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা না গেলেও, একটা দলের সবাই যে রক্তসম্পর্কে কাছাকাছি এটা বোঝা যায়।

এই সঙ্গে লেবরেটারির বিশেষ জাতের ইঁদুরদের কথা বলি। পরীক্ষার সুবিধার জন্য ভাই-বোনের মধ্যে কুড়ি প্রজন্ম বাচ্চা উৎপাদন করে, এই প্রজাতির ইঁদুরদের পিওর স্ট্রেনের ইঁদুর করা হয়। যে কোন একটি অন্যটির যমজের মতন একেবারে এক রকম। কিন্তু রক্তের এত নৈকট্য থাকা

সত্ত্বেও, এদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকে না কেন ? এ সম্পর্কে ডেভিড বারাসের মতটি আলোচনা করতে হয়।

তাঁর মতে পরোপকার বা পরস্পরকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় কেন ? কারণ এর সুফলটা ফিরে আসে। সে সুফলটা পাওয়া যায়, ব্যষ্টিগত না হলেও, বংশগত বা প্রজাতিগত ভাবে। তাইতেই পরস্পরের দেয়ানেয়ার যে প্রবৃত্তির কথা স্বজনদের মধ্যে যা লক্ষ্য করলাম, তা দেখা যায়।

লেবরেটারির ইঁদুরদের মধ্যে যে এ প্রবৃত্তি নেই, তার কারণ হল পুরুষানুক্রমে এরা ল্যাবরেটারিতে বেড়ে উঠেছে। সেখানে খাদ্য, পানীয় কোন কিছুরই অভাব নেই। ঠিক যেমনটি হওয়া দরকার, সব কিছু ঠিক তেমনিই করা হয়েছে। তাই সেই অবস্থার ইঁদুরদের নিজস্বতা একেবারে চলে যায়। এরা মানুষের হাতে আর একটি যন্ত্র মাত্র। আর পাঁচটা যন্ত্র বা রাসায়নিক পদার্থ যেমন পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে, এরাও তেমনি।

কিন্তু যে প্রাণী প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন, উপযুক্ত যারা তাদের বাঁচার অধিকার, ইত্যাদি যেখানের আবহাওয়াতে রয়েছে সেখানে, মেনার্ড স্মিথের স্বজন নির্বাচনও থাকবে বৈ কি। আর তারই চরম উৎকর্ষ মানুষের মধ্যে পরিবার, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, বিশ্বজনীনতা, ইত্যাদির মধ্যে দেখা যাবে এই তো স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গের বক্তব্য শেষ করছি, এ দেশের হনুমানের কথা বলে। এই কাজটি রাজস্থানের হনুমানদের উপরে করা, একটি প্রামাণ্য কাজ। সকলেরই জানা, পুরুষ বাচ্চা হলে, মদ্দা হনুমান যতদিন সে বাচ্চাটা কচি থাকে, ততদিন তাকে দেখলেই মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এই রকম চেষ্টায় বাচ্চার মার সঙ্গে মারপিট করে বাচ্চাটাকে মারবার চেষ্টা করে। এই সময়ে দলের অন্য মাদী হনুমানরা একযোগে আক্রমণ করে আততায়ীর হাত থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচায়। পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী সমাজের একত্ব বা স্বজনবোধই হয়ত এটাকে বলা যেতে পারে। এখানেও প্রকৃতির সেই চেষ্টা, প্রজাতি রক্ষা।

২৮

বায়স সভা

কাক অন্য বহু প্রাণীর তুলনায় সামাজিক প্রাণী। এটা দেখা যায় তখনই, যখন একটা কাক কোনরকম বিপদে পড়ে। কেউ যদি একটা কাককে মেরে ফেলে, তা হলে শ'য়ে শ'য়ে, প্রায় বলা যায় হাজারে হাজারে কাক এসে কা কা করে সবাইকে অস্থির করে তুলবে। আর এ ব্যাপার চলতেও থাকবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অন্ততঃ চারপাঁচ ঘণ্টা এই আন্দোলন (?) চলার পর, তবে ঠাণ্ডা হয়। অর্থাৎ কাকেরা যখন নিশ্চিত হল যে ওই কাকটা সত্যি মরেছে, তখনই ওরা থামে। কারণ ওরাও জানে যে মৃত্যুর উপর আর কোন আপীল কি কোন প্রতিবাদ চলে না।

কাক কখনো অনবধানে গাড়ী চাপা পড়ে রাস্তায় মরে, এ ও দেখেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখেছি, কাকেরা দল বেঁধে প্রতিবাদ বিশেষ একটা করে না। বোধহয় এর প্রথম কারণ হল, যে চাপা পড়ে কাকটা যে মরে গেছে, এটা খুব সহজে ও নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়। তাই আর প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই, এটা বুঝেই বোধ করি আর ডকাডাকি করে না। তা ছাড়া হয়ত আরো একটা কারণ আছে। প্রকৃতিতে যখন একটা কাক মারা যায়, তখন সেটা চাপা পড়া কাকের মতই মাটিতে পড়ে থাকবে। দীর্ঘকাল এটা দেখতে অভ্যস্ত বলেই কাকেরা আর সেটা বেশী মাথা ঘামায় না।

আর একটা অবস্থার কথা ধরা যাক। এ ব্যাপারটা আমি বহুবার দেখেছি। তাই আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। একটা কাক ধরে যদি খাঁচায় রাখা হয়, তা হলে শ'য়ে শ'য়ে কাক কা কা করতে করতে সেখানে জড় হবে। শুধু মুখেরই চেঁচামেচি নয়। খাঁচাটার গায়ে ঠুকরে ঠুকরে সেটাকে ভাঙবার চেষ্টাও করে। খাঁচাটা যদি মোটা তারের বা লোহার হয়, তা হলে সেটাকে ভাঙা সম্ভব হয় না। কিন্তু হয়ত ভাগ্যক্রমে টানাটানি করতে করতে ছিটকিনি খুলে দরজাটা মুক্ত হয়ে, কাকটার বন্দীদশা ঘুচে যেতে পারে। এ'ও যেমন হতে দেখেছি, তেমনি দেখেছি, কাঠির খাঁচার কাঠি খুলে অন্য কাকেরা বন্দী কাকটাকে ছেড়ে দেয়।

কাকেদের এই যে সামাজিকতা, এটা ভোরবেলা উঠে খাদ্য সন্ধান করতে থেকে সুরু। কোথাও খাদ্য থাকলে, তা এরা চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দেয়। একসঙ্গে ঠিক দলবদ্ধ ভাবে কাকেরা বাস করে, এ কথা অবশ্য ঠিক বলা যাবে না। তার কারণ, এরা যখন বাসা করে, তা এক জোড়া কাক তাদের নিজেদের ডিম পেড়ে বাচ্চাদের জন্যই বানায়। এ বাসা অবশ্য মানুষের মতই পারিবারিক। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে প্রতিদিন রাত্রে বিশ্রামের জন্য চাই শুধু গাছের ডাল। আর বাসাটা শুধু বাচ্চাদের জন্য। ডিম ফুটে বাচ্চা বড় হয়ে গেলে, আর বাসার দরকার নেই। তাই প্রতিবার ডিম পাড়ার সময়ে নতুন বাসা করতে হয়। পাকাপাকি বাসা প্রাণীদের মধ্যে মানুষ ছাড়া বোধ হয় একমাত্র মৌমাছি, পিঁপড়ে ও উই-পোকারাই করে।

সামাজিকতার একটি বড়দিক হল, মেলা, মেশা, সভা, ইত্যাদি। কাকেরা কি সভা করে ? এ কথা জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই বলবেন হাঁ। কারণ অনেকেই দেখেছেন পাড়ার কোন একটি বাড়ীর চিলের ছাদের উপরেই সাধারণত বিকালের দিকে দেখা যায়, একদল কাক ছাদে এসে বসেছে। এদের বসাটাও বেশ সার বেঁধে, পাঁচিল বা রেলিংয়ের উপর। এরা বসেও সাধারণত লাইন করে পাঁচিলের উপর, একদল আর এক দলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। সমান্তরাল ভাবে বসার ব্যাপারে কাকের সঙ্গে অন্য পাখীদের একটু তফাৎ আছে। যেমন পায়রা। পায়রারা ঠিক এ রকম গুছিয়ে যেন সভা করছে, এ রকম করে না। তাই তাদের দলটা যেন একটা দঙ্গল মতন। চড়াই বা শালিকদেরও তাই। তবে, পায়রার দঙ্গল খুব বড় হতে পারে, এক জায়গায় কতগুলি পায়রা বাস করছে তার উপরে; শালিক বা চড়াইয়ের দল ছোট হয়।

এ সব ছাড়াও কাকেদের, যাকে সভা বললাম, এ রকমের এক জোট হবার ব্যাপারে, আরো কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত যে দিন দুপুরের দিকে হয়ত বেশ একটু বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তারপর বিকালের দিকে মেঘলা থাকলেও বেশ ধরন হয়েছে, সেই সব বিকেলেই কাকেদের এই সভাগুলো হয়। কাজেই মনে করা যেতে পারে এসভা একটু ঠান্ডাতেই হয়। তবু কিন্তু সকালের দিকে যদিও ঠান্ডা, তবু সে সময়ে এ সভা বসে না। হয়ত সকালটা কাজের সময়, খাবার খোঁজার, তাই তখন সভা বসে না। এ থেকে মনে করা যেতে পারে, যে এটা ওদের কাজের অঙ্গ নয়। হতে পারে বিশ্রাম, কি একটু আরাম উপভোগ। এইরকম জমায়েতে সাধারণত

পনেরো, কুড়ি, বড়জোর তিরিশ, চল্লিশ পর্যন্ত হয়। অথচ কোন একটা কাক বিপদে পড়লে, এর চেয়ে ঢের বড় জমায়েৎ হয়ে যায়। কাজেই এটা ঠিক জমায়েৎ করার জন্যই করা নয়।

যদিও সভা বলেছি, তবু এখানে জমা কাকেরা কোনরকম ডাকাডাকি করে না। বরং সভা শেষ হলেই তারা কা কা করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। আরাম উপভোগের কথা যে বললাম, সেটা মনে হয় এ জন্য, কারণ দেখা যায় যে একটা কাক তার পাশের কাকটাকে গা খুঁটে আদর করছে। ঠিক এই সভাটা যে কি তা আমাদের জানা নেই। তবে মনে হয় এটা কাকেদের "সামাজিকতার" একটা দিক। বিবর্তনের গতিপথ যদি আমরা লক্ষ্য করি, তা হলে মনে হয় প্রকৃতি বিবর্তনকে সাহায্য করবার জন্যই যেন, প্রাণীকে আরো বেশী সামাজিক করে তোলার দিকে চালাচ্ছে। তার মানে এ নয়, যে আমাদের মত প্রকৃতিও সামাজিকতা পছন্দ করে। প্রকৃতির কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। প্রাণের যে বৈচিত্র্য, তার মাঝখানেই রয়েছে, প্রকৃতির হাতে বিবর্তিত অজস্র জিন। এক একটি জিনের মধ্যে এক একটি বিশেষ গুণ বা চরিত্র। এর প্রত্যেকটি আবার বংশানুক্রমিক। জিনের এই অজস্র বৈচিত্র্য, এত রকমের প্রাণীকে রক্ষা করতে ও প্রাণীর বিবর্তনের জন্যই প্রয়োজন। এ জিনকে রক্ষা করার দুর্গই হল সামাজিকতা। তাই বিবর্তনে প্রাণীকে আরো সামাজিক করতে চাইছে প্রকৃতি। যে প্রাণী বেশী সামাজিক, তাদের বাঁচার সুবিধাটা বেশী।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইন্দোনেশীয় গণ্ডার প্রায় বিলুপ্তির পথে। কারণ এরা থাকে একেবারে একা। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীর হঠাৎ দেখা হলে, তবেই এদের বাচ্চা হয়। অথচ এদের লোহার মত শরীর, দীর্ঘ আয়ু। তবু সামাজিক নয় বলেই এরা বিলুপ্তির পথে।

কাকেদের এই সভা কি বা কেন জানি না। তবে এটা যে ওদের সামাজিকতার একটা দিক এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

২৯

পারস্পরিক

মানুষের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, এ'গুলি কি অন্য প্রাণীরা, বিশেষ করে মানুষের গৃহপালিত প্রাণীরা টের পায় ? তবে মনে হয় তা সম্ভব। বিশেষ করে, যদি সম্ভব হয়, তা হলেও সেটা সবচেয়ে বেশী সম্ভব কুকুরের ক্ষেত্রে। কারণ কুকুরকেই মানুষ গৃহপালিত করেছে প্রথম। তাই কুকুরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সব চেয়ে বেশী দিনের। বেশী দিন মানে, দু চার বছরের ব্যাপার নয়; হাজার হাজার বছর। তখন সভ্যতার সূচনা হয় নি। খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ তখনও চাষ করে খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। তখন তারা দলবন্ধভাবে শিকার করত। আগুনের ব্যবহার সবে একটু শিখেছে। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখবার কোন উপায়ই জানত না। রাত্রে বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য চারিধারে আগুন জেবলে রাখত।

নিজেদের ফেলে দেয়া মাংস কি হাড়ের দু একটা টুকরো, তারা আগুনের পরিধির বাইরে ফেলে দিত। এইগুলো খাবার জন্য নেকড়ে জাতের একদল প্রাণী ভীড় করত। মানুষ ক্রমশঃ দেখলে, এই প্রাণীগুলোকে তো পোষ মানলে হয়। পাহারা দেয়া, শিকার তাড়া করা, এ সব ব্যাপারে তো এই প্রাণীগুলোকে বেশ কাজে লাগানো যায়। সেই থেকেই হল মানুষের সঙ্গে কুকুরের যোগাযোগের সুরু। সে কতদিন হিসাব আছে না কি ?

এবার আমার বার বার দেখা একটা ব্যাপার বলি। আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীটাই আমার কাকার বাড়ী। মাঝে পাঁচিল নেই। মাঝের দরজাটাও খোলাই থাকে। ও বাড়ীতে আমার একটি ভাইপো আছে। তার বয়স হবে বছর তিনেক। আমাদের বাড়ীতে একটি পমিরেনিয়ান কুকুর আছে। আমার ভাইপো আর এই কুকুরটির খুব ভাব। ওর ঘাড়ে যখন তখন চড়ে বসে, ওর লোম ধরে টানলেও ওকে কামড়ায় না।

সেদিনেই প্রথম লক্ষ্য করলাম। আমার ভাইপো, জয়, কি একটা ব্যাপারে বায়না ধরে খুব কান্না সুরু করেছে। বায়নার কান্না। ভোলাবার শত চেষ্টাতে থামবে না। কুকুর, সিলটু, এ বাড়ীতে ছিল। জয় কান্না সুরু করতেই ও

কান খাড়া করে শুনল। তারপর একছুটে ও বাড়ী। জয় যে ঘরে হাত পা ছুঁড়ে বায়না করছে ও কাঁদছে, সেই ঘরের দরজায় গিয়ে সিলটুও দাঁড়িয়ে রইল। সিলটুরও মুখের ভাবটা যেন একটু করুণ, একটু কৌতুহলী।

কুকুরের মুখে চোখে এত ভাবান্তর ঘটে কি ? ঘটে। যে সব প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বেশী, তাদের ভিতর ভাবের আদানপ্রদান হয় অনেক বেশী। ওরা তো আর মানুষের মতন কথা বলতে পারে না, তাই মুখভঙ্গীর রকমফের ওদের অত্যাবশ্যক। তাই নেকড়ে, হায়না, কুকুর, এদের মুখভঙ্গীর বহু রকমফের করতে হয়। ডাকের ইতরবিশেষ ছাড়া, মুখভঙ্গীর এই বৈচিত্র্যে এদের একজন আর একজনের মনোভাব বুঝতে পারে। তাতে এদের একসঙ্গে কাজ, তা শিকার ধরাই হক বা অন্য কিছু হক, করতে সুবিধা হয়। জীববিজ্ঞানী ফক্স, এ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করেছেন। বাড়ীর কুকুরটাকে নেহাৎ মানুষের বেশী যদি না ভেবে, সঠিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব যদি আমরাও নি, তবে এ'রকম অনেক ভাল গবেষণার কাজ আমরাও করতে পারব। যাই হক আবার সিলটুর মুখের ভাবের কথাতে ফিরে আসি।

বলছিলাম না, মুখের ভাবটা জয় যতক্ষণ কাঁদত, সিলটু ওমনি মুখ করে ঘরের দরজার উপর দাঁড়িয়ে থাকত। এতে জয়কে শান্ত করতেও সুবিধা হত। কারণ যারা ভোলাবার চেষ্টা করত, তারাও সিলটুকে দেখিয়ে বলতে পারত, "ওই দেখ, তুমি কাঁদছ দেখে সিলটুও তোমাকে চুপ করতে বলছে।" আর জয়ও ওর সঙ্গে খেলা করবার জন্য চুপ করে যেত।

তিন বছরের ছেলে, আর চার বছরের ছেলেতে অনেকটা তফাৎ। চার বছরের ছেলে যেন আরো বেশী জেদী, অবুঝ, বায়নাদার হয়ে ওঠে। তখন একবার বায়না ধরে কাঁদতে সুরু করলে, আর সহজে থামতে চায়না। কান্নাটা-ও যেন হয়ে ওঠে একঘেয়ে, আরো সশব্দ, আরো বিরক্তিজনক। জয়েরও সেই বয়সটা এসে গেল, ক্রমে। সেই একটানা চেঁচিয়ে কান্না, থামতে না চাওয়া, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে যেমন বাড়ীর লোকেরাও যেমন জয়ের উপর একটু বিরক্ত হত; তেমনি সিলটুর আচরণেও একটা পরিবর্তন দেখা গেল। দেখা গেল এখন আর জয় কাঁদলে সিলটু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। জয়ের এখনকার কান্নাটা যে অনেকটা অকারণ, এটাই কি সিলটু বুঝতে পেরেছিল ? কে জানে ?

বর্তমানে বিজ্ঞানে, "কমিউনিকেশান" কথাটির গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। কথাটির বিভিন্ন ভাবে বাংলা করা হয়েছে। এ গুলি হল সংযোগ, যোগাযোগ,

ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদি। পুরো ব্যাপারটার ভিতর কিন্তু রয়েছে একটা জিনিস কতটা বেশী জ্ঞাতব্য তথ্য যোগাযোগের ফলে দেয়া যাচ্ছে। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সমস্ত যোগাযোগই কিছু না কিছু তথ্য সরবরাহ করছে। রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশান ইত্যাদির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ট্রেন এসে পোঁছল, কি একজন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এলো, কথা তো বটেই, এমনকি কারুকে দেখে হাসলাম, সব থেকেই কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কমিউনিকেশানকে কেন্দ্র করে আজ দুটি বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এর একটি হল নরবার্ট ভিনারের সৃষ্টি, সাইবারনেটিকস। আর একটি স্যাননের ইনফরমেশান থিয়োরি।

প্রাণীদের মধ্যেও পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন বলেই তা আছে। মানুষের পক্ষে যত বেশী তথ্য প্রয়োজন, প্রাণীদের তথ্য ও জ্ঞাতব্য, দুই খুবই কম। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যখন বিরোধ হয়, তখন আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে প্রতিদ্বন্ধীকে ভয় দেখানর উদ্দেশ্যে দাঁত দেখায়, চিৎকার করে। কে যে এই বিরোধে জিতবে, এটা শেষপর্যন্ত জীবনমরণ লড়াই করে ঠিক করতে হয় না। দুর্বলতর প্রাণী যে, সে নতি স্বীকার বোঝানর ভঙ্গীতে, মুখের ভাব বদলে, দাঁত বার না করে, ল্যাজ গুটিয়ে শুয়ে পড়ে কি পিছন ফিরে থাকে। ওই একই ভাব বোঝাতে বড় শিংওয়ালা ভেড়া, যে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে, সে বিজেতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে তার গা চাটে। বাড়ীর এ্যাকেয়েরিয়ামে কিসিং গুরামি মাছ অনেকেই পোষেন। এরা একজন আর একজনের মুখে মুখ ঠেকিয়ে ঠেলে। এ'ও একজন আর একজনকে শক্তিটা জানাতে।

গেজেল জাতের হরিণ, যদিও এদের লম্বা শিং আছে, কিন্তু তা ব্যবহার না করে শুধু শিং তোলে। তাতেই জানিয়ে দেয়া হয় কার কতটা ক্ষমতা। এ যেন ঠিক গৃহপালিত ছাগলের লড়ায়ের মত, বাহাদুরীটা জানানো আর কি। প্রাণীদের ভাব কমই। তাই তার অভিধান খুব ছোট। আর প্রাণী হিসেবে তার ভঙ্গীও বিভিন্ন। এইতেই বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য।

৩০

অভিনয় অভিনয় নয়

একটা কাজের পরিবর্তে, দেখাবার জন্য আমরা আর একটা কাজ করি। এটাকে বলা নিজেকে বাঁচাতে একরকমের অভিনয় আর কি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে, পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য যে এই ধরনের কার্যকলাপ যা বিপ্লবীরা করতেন, তা আজ গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাণীদের মধ্যেও এ ধরনের বিকল্পকরণ বা ডিসপ্লেসমেন্টের কাজ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, তারা অভিনয় করার জন্য, কি অন্যের চোখে ধুলো দেবার জন্য এ সব কাজ করে না। এ' আচরণে বলা যায় প্রকৃতিই তাদের বাধ্য করেছে, আত্মরক্ষারই খাতিরে।

খাদ্য সংগ্রহ, প্রজাতি রক্ষার জন্য সঙ্গিনী সংগ্রহ, এ সব কাজে একটি প্রাণীর সঙ্গে আর একটি প্রাণীর বিরোধ ও তার জন্য লড়াই হতে বাধ্য। কিন্তু লড়াইটা যাতে এমন মারাত্মক পর্যায়ে না পৌঁছয়, যাতে এর মধ্যে কেউ গুরুতর আহত হয়, কি মারা যায়, এইটা করতেই প্রাকৃতিক নির্বাচনে এই ধরনের বিকল্পকরণ বা ডিসপ্লেসমেন্টের উদ্ভব হয়েছে। পাখীদের এই ধরনের কাজের উপর টিম্বারজেন অনেক গবেষণা করেছেন। সে সম্পর্কে আলোচনা করলে এই বিকল্পকরণ বা ডিসপ্লেসমেন্ট এ্যাকটিভিটির উপর একটা পরিস্কার ধারনা করা সম্ভব।

হেরিংগাল পাখীরা মাটিতে বাসা করে। অবশ্য বাসা করাতো ডিম পেড়ে বাচ্চা হবার জন্য। কিন্তু তার আগে ঘর বাঁধবার জন্য চাই সঙ্গিনী। একই জনকে হয়ত অন্য কেউ চেয়ে বসল। এর ফলে সেই দু'জন দাবীদারের মধ্যে একটা বিরোধ স্বাভাবিক। সেটা যাতে খুনোখুনি অবধি না গড়ায়, সেই জন্য যে একটু বেশী শক্তিশালী সে হয়ত বাসা করার কার্যকলাপ দেখাতে সুরু করে। এমনকি মাটিতে গর্ত করে, পাতা যোগাড় করে তার উপর বিছাতে পর্যন্ত সুরু করে দেয়। এর ফলেও অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী হার স্বীকার করে চলে যায়। দেখা যাচ্ছে গায়ের জোরের বদলে কৌশলই

এখানে জিতল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এ কৌশলটা বুদ্ধিজাত নয়। এটা সহজ প্রবৃত্তিজাত।

বাসা করার ভঙ্গী যেমন কোন কোন পাখী দেখায়, আর এক রকমের সামুদ্রিক পাখী—ঝিনুক খায় বলে তাদের নাম, অয়েষ্টার ক্যাচার—এদের মধ্যে যখন ওই রকম বিরোধ দেখা দেয়, তখন যে পাখী শক্তিমান, সেই পিঠের পালকে ঠোঁট গুঁজে, যেন ঘুমিয়ে পড়ছে, এই ভাব দেখায়। যেন ভাবটা হল, তোমার সঙ্গে আর কি যুদ্ধ করব ? তার চেয়ে বরং একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক। যে পাখীর জোরটা বেশী, সেই কিন্তু এ রকম নিশ্চিন্ত আরামের ভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে, যার লড়াই হলে হারার সম্ভাবনা সে পারে না।

ষ্টিক্‌লব্যাক বলে একরকম মাছ নিয়ে টিনবারজেন প্রচুর গবেষণা। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মধ্যে না গিয়ে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বোঝাতে এরা বালিতে গর্ত করে। এই গর্ত যার যত গভীর ও ভাল হয় সেই প্রতিদ্বন্দ্বি-তায় জিতল। হেরে যাওয়া মাছ বিজয়ী মাছের এলাকাকে পর্যন্ত খাতির দেখিয়ে তার ধারে কাছে আসে না।

মান্দারিন হাঁস থেকে সুরু করে বহু রকমের হাঁস আছে, যারা খুব কমণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসে। এরা প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখাতে গা খোঁটা, পালক পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ, নিজেকে সুন্দর করবার জন্য করে থাকে। প্রকৃতির প্রেরণায় না হলেও, মানুষ নিজে আত্মসচেতন হয়েই সাজ, পোষাক প্রসাধন এ সব করে। ঘড়ি ঘড়ি মানুষের ফ্যাসান বদলাচ্ছেও ঠিক এই কারণে। মানুষের ফ্যাসান নিয়ে লিখতে গেলে বহু লেখা যায়। কিন্তু সেটা আমাদের বিষয় নয়।

ইউরোপের যে ঝুঁটিওয়ালা সারস, তারা যুদ্ধের বদলে যেন মাটি থেকে কোন পোকা ধরে খাচ্ছে, সত্যি পোকা না থাকলেও এই রকম ভঙ্গী করে। মন গড়া করে আমাদের মনে হয়, যে এর মাধ্যমে দেখাতে চায়, যে আমার কোন খাদ্যের অভাব নেই। তাই গায়ে জোর যদি থাকে তো আমারই থাকবে। কাজে কাজেই আমার বাহাদুরীটা স্বীকার করে নাও।

পায়রা জাতের কিছু পাখী আছে, এদের পুরুষরা, অন্য এক পুরুষ পাখীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য, শক্তিমান পুরুষটি একাই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ভঙ্গীটি দেখায়। অকারণ শক্তিক্ষয়ের বদলে এতেই কাজ হয়।

দুটি মোরগের লড়াই অনেকেই দেখেছেন। একেবারে খুনোখুনি ব্যাপার না হলেও, ঠোঁট ও নখের আঘাতে একটার কিছুটা জখম হবার সম্ভাবনা থাকে। এটাও যাতে না ঘটে, তার জন্য জোরালো মোরগটাই গলার পালক ফুলিয়ে, ঝুঁটি উঁচু করে, মাটি থেকে যেন খাবার খুঁটে খাচ্ছে, এইরকম ভাব করে। মোরগদের এই রকমের ঝগড়া বা কাজিয়া আমিও অনেকবার দেখেছি। এখানে মজার ব্যাপার হল, যখন দুটো মোরগের মধ্যে একটা গলার পালক ফুলিয়ে, মাটি খোঁটে ঠোঁট দিয়ে; তখন অন্যটাও তাই করে। কে কতটা গলা ফোলালো, এই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা। এ সময়ে দুজনেই দু'জনকে লক্ষ্য করতে থাকে। যে গলা বেশী ফোলাতে পারল, তার কাছে অন্যজন হার মেনে নেয়।

মন্দা পায়রাদের মধ্যেও এই রকম গলা ফুলিয়ে, বক্‌বকম্‌ করে গোল হয়ে ঘোরার প্রতিযোগিতা হয়। এতেও সেই জেতে, যাকে মাদি পায়রাটা গ্রহণ করে।

কিছুদিন আগে জীববিজ্ঞানী ডেসমন্ড মরিস "নেকেড এপ" ও "হিউম্যান জু" এই দুখানি বই লেখেন। এই দুখানি বই অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতে তিনি দেখান, অকারণে হিংসা, হত্যা, আঘাত প্রাণীরা পরস্পরকে করে না। যেখানে খাদ্য খাদক সম্পর্ক সেখানেও ক্ষুধার জন্য ছাড়া হত্যা বা হিংসা অজানা। প্রাণীদের অবশ্যই লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়, তবু মানুষ যে রকম তথাকথিত স্নায়ুর চাপে ভোগে, বন্দী অবস্থায় ছাড়া, প্রকৃতিতে এ রকম হওয়া প্রাণীদের সম্ভব নয়। মানুষের হাতে বন্দী অবস্থাতে প্রাণীরা হিষ্টিরিক হয়ে উঠতে পারে; এমন কি নিজেরা নিজেদেরই আঘাত করে, প্রায় আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে এ ও দেখা গেছে।

প্রাণীদের আচরণের কথা ভাল করে বুঝলে, তবেই তো আমরা বুঝব প্রকৃতির নিজস্বতা কোনখানে। যেখানে প্রকৃতির নিজস্বতা তাই স্বাভাবিক। আর বাইরে যা, তাই অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক আর অসুস্থ এ দুটি আমাদের কাছে একার্থক। আর তাই তো হবার কথা। তবু এই বর্তমান আলোচনায় দেখলাম, প্রকৃতিতে প্রাণীর নিজস্ব আচরণে ডিসপ্লেসমেন্ট বা বিকল্পকরণ মনে হয় যেন অস্বাভাবিক। কিন্তু খুন, জখম, রক্তপাতের মতন গুরুতর অস্বাভাবিকতা বা অসুস্থতা দূর করার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে এ ব্যবস্থাগুলি কি অপূর্বভাবে স্বাভাবিক। —

৩১

আরো দেখা, আরো শোনা, আরো অনুভব

প্রাণীজগতে কোন প্রাণীর কোন পথ ধরে যে বিবর্তন ঘটেছে বা ঘটবে, তা বলা যায় না। কেন না ভ্রূণ অবস্থা থেকে, যখন কোন প্রাণী বেড়ে উঠেছে, তখন তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ক্রমবিকসিত হয়ে, বিশেষ কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। তার ফলে মস্তিষ্কের কাজ হবে চিন্তা, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা; চোখের কাজ হবে দেখা; কানের শোনা; ইত্যাদি। কোন প্রাণীর মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়টির ক্ষমতা কতটা বেশী হবে, এ কথাও বলা যায় না।

একসময় কোন কোন বিবর্তনবাদীরা ভেবেছিলেন, বিবর্তনের চিলেকোঠা বুঝি মস্তিষ্কের বিবর্তনে চিন্তা, বিশেষ করে বিমূর্ত চিন্তার আবির্ভাবে। তা যদি বলা হয়, তবে তো মানুষকেই সেই চিলেকোঠার মালিক বলতে হবে। আবার অন্য একদল বিবর্তনবাদীর মতে, সমাজগঠনের পারিপাট্যই বিবর্তনের চিলেকোঠা। এ যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে আবার চিলে-কোঠার মালিক হয়ে যাচ্ছে মৌমাছি, পিঁপড়ে কি উইপোকা। কিন্তু একজন কেউ বিবর্তনের চরমে উঠে বসে আছে, এ চিন্তাটা মানুষের মনগড়া চিন্তা। এ চিন্তা ব্যক্তি ও ভাববাদী। বিজ্ঞান এ'রকম চিলেকোঠায় কিছু বসিয়ে রাখে না। তাই বিজ্ঞান বলে, মানুষ যেমন চিন্তা করতে পারছে, কুকুর তেমনি গন্ধ পায় অসাধারণ। এক এক প্রাণীর বিবর্তন হয়েছে এক এক দিকে। বিবর্তন বুঝতে হলে পুরোটা বুঝতে হবে।

একজন জীববিজ্ঞানীর মতে মাছের কান হল তার শরীরের দু'পাশের স্নায়ুসূত্র, যাকে ল্যাটারেল লাইন অরগ্যান বলে। কথাটা নিয়ে ভাবা দরকার। বিশেষ ধরনের কাঁপন, যা শব্দ হয়েছে তা আমরা কানে শুনি। কাঁপন বা তরঙ্গ মাছেরা এই ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে। এ্যাকোয়েরিয়ামে সামান্য একটা আঙুলের নখ দিয়ে একটু টোকা দিলে দেখা যাবে, সেখানের সব মাছগুলো একসঙ্গে চমকে উঠে, সেই কাঁপনের কাছ থেকে সরে যায়।

এবার এ্যাকোয়েরিয়ামের আর একটি পরীক্ষার কথা বলি। এতে ছিল,

সাইজের বড় থেকে ছোট হিসাবে যথাক্রমে, একটা পুঁটি, দুটো এঞ্জেল, কয়েকটা সোর্ডটেল, কয়েকটা মলি, ইত্যাদি। এ্যাকোয়েরিয়ামের উপরের

মাঝামাঝি জায়গায়, নিচে ফুটোওয়ালা কাঁচের পাত্রে সরু সরু কেঁচো দেয়া হত খাবার জন্য। খাবার দিলেই প্রথমে ভীড় করত ছোট মাছেরা। গোড়াতেই কত তাড়াতাড়ি কতটা খেয়ে নেয়া যায় সেই চেষ্টা আর কি। তারপর আসত ওদের মধ্যে বড় যে মাছ এঞ্জেল, পুঁটি। বড় মাছ এলেই যে তাদের দেখে ছোট মাছেরা সরে যেত তা কিন্তু নয়। বড় মাছগুলো এসে ওদের পাশের ও ল্যাজের পাখনা দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে ঢেউ তুলত। সেই ঢেউ ল্যাটারাল লাইন অরগানে অন্য মাছের লাগলে তারা বুঝত যে এ ঢেউয়ের কাঁপনটা একটু বড় জাতের, সেই বুঝেই জায়গা ছেড়ে দিত।
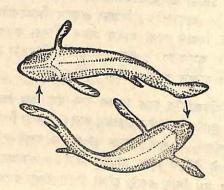
টিন্‌বারজেন দেখিয়েছেন যে এক জাতের দুটো মাছের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা সুরু হয় তখন ঠিক একইভাবে পরস্পরের দিকে জলের

তরঙ্গ কাঁপন সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা করে। যার তরঙ্গটা জোরালো, সেই জেতে। অন্যজন সেখান থেকে চলে যায়। মাছের জগতে এ ব্যাপারটা খুবই শান্তিপূর্ণ।

একদিকে যেমন মাছের কথা বললাম, বিবর্তন হয়ে যেখানে কানও তৈরি হয় নি, আবার এই কানই এমন পর্যায়ে উঠে গেছে যে কান দেখার কাজও করে। কানের এই অসাধারণ বিবর্তন দেখি বাদুড় আর চামচিকের মধ্যে। বাদুড় আর চামচিকে নিশাচর প্রাণী। আবার এদের রাতের অন্ধকারে বহু ওড়াউড়ি করতে হয়। তা ছাড়া আমেরিকার কিছু বাদুড় দিনের বেলা ম্যামথ কেভ বা এ'ধরনের পাহাড়ের গুহায় থাকে। এসব গুহাতে হাজার হাজার বছর ধরে সূর্যের আলো ঢোকে নি। কাজেই বিবর্তনে ও প্রকৃতির নির্বাচনে চোখের বদলে এদের কান এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শ্রুতিপারের যে শব্দতরঙ্গ, যাকে আমরা আলট্রাসনিক কম্পন তরঙ্গ বলি, তাতেও এরা শুনতে পায়।

শুধু শুনতে পায় বললে কমই বলা হল। নিজেদের গলায়ও এরা যে শব্দ বার করে, তাও এই শ্রুতিতরঙ্গ পারের। এই তরঙ্গ আবার যে কোন জায়গায় ধাক্কা খেয়ে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষায় আমরা যাকে প্রতিফলিত বলি, তাই হয়ে যখন ফিরে আসে, বাদুড় ও চামচিকেরা তা শুনতে পায়। শুনতে পাওয়া শুধু নয়, অন্ধকারে এরা যখন ওড়ে, আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না এ'রকম তরঙ্গ এরা ছাড়ে। কোন বাধায় লেগে সেই তরঙ্গ যখন ফিরে আসে; ওড়ার সময় তখন ওরা এই বাধা অতিক্রম করে উড়ে যায়।

পরিষ্কার দেখা গেছে যে, একটা পার্টিশান হয়ত সিলিং পর্যন্ত উঁচু নয়, নিচু হয়ে ওড়ার সময়েও পার্টিশানের কাছে এসে অন্ধকারেও চামচিকে ঠিক এটি পার হয়ে যায়। এমনকি, ঘরে একটা তার খাটানো থাকলেও, অন্ধকারে চামচিকে সেই তারে সহজে ধাক্কা খায় না। নারকেল কি সুতোর দড়িতে কিন্তু এই সাফল্যের সম্ভাবনা একটু কম। এর কারণ হল শ্রুতিপার তরঙ্গও অন্য শব্দ তরঙ্গের মত, দড়ির গায়ে ভাল প্রতিফলিত না হয়ে যেন দড়ির খস্‌খসে গায়ে আটকে যায় ও তার সঠিক প্রতিফলন হয় না।

এমনিভাবে কোন প্রাণীর যে কোন পথে বিবর্তন ঘটেছে, তা অতি বিচিত্র। মৌমাছিরা বেগুনিপারের আলোক তরঙ্গে দেখতে পায়। তাই আমাদের কাছে যে ফুলটার পাপড়িগুলো লাল, আমরা শুধু তাই দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু বেগুনীপারের আলোয় চোখটি সাধা বলে সে ফুলের

মধু যেখানে আছে, সেইখানটাই মৌমাছি আরো ভালো দেখতে পায় ও তাতেই কাজ সিদ্ধ হয়।

খুব খুঁটিয়ে বুঝে দেখার দরকার যেমন আমাদের, তেমন দরকার বা ক্ষমতা কোনটাই পতঙ্গদের নেই। কিন্তু হঠাৎ কোন কিছু চলে গেলে বা এলে, সেটা যাতে বিশেষভাবে নজরে পড়ে ও তার জন্য সবরকম সতর্কতা নিতে পারে, সেজন্য এদের থাকে কম্পাউন্ড-আই। এর লেন্স অনেক, ও যেন হীরে কেটে কেটে বসানর মত। তাই আলো আসার পথে কোন কিছুই এ চোখে ধরা পড়বে।

আবার ধরা যাক বেঙের কথা। বেঙ যদিও বেশ লম্বা লম্বা লাফ দিতে পারে, আর জলেও সহজভাবে যাতায়াত করে, তবু এরা ঘাড় ঘোরাতে পারে না একেবারেই। চোখের গতিও সামান্য। এমন অনেক পতঙ্গ আছে, যাদের চোখ এদের চোখের চেয়ে অনেক বেশী নড়াচড়া করতে পারে। তবু এদেরও শিকার ধরতে হয়। কোন কিছু নজরে পড়লে, পুরো শরীরটা ঘুরিয়ে তার দিকে নজর করে নেয়, সেটা শিকার কিনা। ওদের জিভের একটা দিক মুখে আটকানো থাকে, আর একটা দিক খোলা। শিকারের উপর টিপ করে এর জিভটাই ছুঁড়ে দেয়। মানুষও জিভ ব্যবহার করেছে বহু ভাষণে, তবু এ ভাবে জিভ ছুঁড়ে খাবার বা শিকার ধরা, এও প্রাণীজগতে অনবদ্য।

বিবর্তনে আমরা মানুষকে অসাধারণ মনে করি। বিবাহ, এক স্বামী, এক স্ত্রী, প্রেম, ইত্যাদি নিয়ে লক্ষ বই লেখা হয়েছে, কিন্তু এ'ব্যাপারেও মানুষের সমকক্ষ অনেক প্রাণীই। যেমন কাক, চখা, রাজহাঁস, হাঁস, ঈগল, এরা পাখীদের মধ্যে; আর গিবন অন্য প্রাণীদের মধ্যে; যারা জীবনে একবারই সাথী বেছে নেয়। কিন্তু তাদের নিয়ে কতটুকুই বা লেখা হয়? বোধ হয় আদি কবি বাল্মিকী, আর কিছু কবিই এর ব্যতিক্রম।

৩২

সময়

সময়। যে সময় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন আইনষ্টাইনের মতন লোক সেই পর্যায়ে সময়কে উপলব্ধি করাই বোধ হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সময় সকলের। শুধু মানুষের নয়। মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণীরও সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। জীববিজ্ঞানীরা একে বলেছেন ওদের শরীরের ঘড়ি—বিল্ট ইন ক্লক। জীববিজ্ঞানীদের এ ধারণার কারণ হল, সব প্রাণীই, একটি বীজাণু থেকে তিমি পর্যন্ত, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যেটুকু তাদের আয়ু, তা একটা সময়সীমার মধ্যে। তাই তাদের এরই মধ্যে জীবনের সব কিছু করে ফেলতে হয় বলেই, ওই সময়টুকুকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়।

সকালে সূর্য ওঠলেই আলো ফুটে ওঠে। খাবার খুঁজতে সুরু করতে হয় তখনই। আবার সন্ধ্যার অন্ধকার হলেই খাদ্য সংগ্রহ শেষ হল। অবশ্য পেঁচা কি বাদুড়ের মত কিছু প্রাণী আছে, যারা রাতে খাদ্য সংগ্রহ করে। উল্টো হলেও এদেরও দিনরাত্রির পর্যায়টা সমান। আমাদের এখানের হিসাবে আমরা এককোষী প্রাণী, বীজাণু, এদের ধরছি না। বেশীরভাগ বড় প্রাণীর ক্ষেত্রেই, তাদের খাওয়া, নিঃশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, ইত্যাদি সব কাজকর্মই একটা সময়ের তাল বা ছন্দে চলে, যেমন ভাবে চলে আমাদের ঘড়ির মিনিট সেকেন্ডগুলো। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ছন্দ-তালই প্রাণীর নিজস্ব ঘড়ি।

যাই হোক, এখানে আমরা কুকুর, বেরাল এই সব প্রাণীদের কথাই বলব। আমার নিজের দীর্ঘদিনের প্রশ্ন, মানুষ ছাড়া এই সব প্রাণীর কি অতীত, ভবিষ্যৎ এ'গুলির বোধ আছে ?

আমাদের বাড়ীর কুকুরটার কথা বলেই সুরু করি। বিকেলে চা খাবার সময় আমাদের ছিল সাড়ে তিনটেয়। বাড়ীর সকলের চা খাওয়ার সঙ্গে

কুকুরটার সম্পর্কও ছিল একটু বিশেষ ধরনের, কারণ সকলেই চা খেতে খেতে একটুকরো বিস্কুট কুকুরটাকে দিত। আর এইটাই ছিল বাড়ীর লোকের বৈকালিক চা পানের ব্যাপারে ওর উৎসাহের কারণ। দুপুরের দিবানিদ্রায় বাড়ীর সকলেই মগ্ন। কুকুরটাও সোয়া তিনটে পর্যন্ত হয়ত ঘরের এক কোণে দিব্যি ঘুমিয়েছিল। কিন্তু সোয়া তিনটে বাজার সংগে সংগে ও উঠে পড়বে। শুধু উঠে পড়া নয়। যে চা করে, তার কাছে গিয়ে ও তখনি হাজির। তাকে ঘুম থেকে তুলে, সোয়া তিনটেয় চা করতে পাঠালে তবে তো সাড়ে তিনটেয় চা। আর তবেই তো ওর ভাগের বিস্কুটের টুকরো। এর মধ্যে একটা যেন বিশেষ লজিক: সময় চা বিস্কুট।

কুকুরের মাথায় কি ঐ লজিক ঢোকে ? এ আলোচনার আগে বেরালের কথা একটু বলে নি।

আমার ছোড়দির বাড়ী কয়েকটা পোষা বেরাল আছে। তার মধ্যে পুসী বলে একটা বেরাল ছিল একটু বেশী চটপটে। ওদের দুপুর বেলার খেতে যাবার সময় ছিল সাড়ে বারোটা আর রাত্রে দশটা। আমার ছোড়দি, ছোট জামাইবাবু খেতে বসে ওই বেরালগুলোকেও খেতে দিতেন। সময়ানুবর্তিতাটা বেরালগুলোর এমনই মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল, যে ছোড়দি ও ছোটজামাইবাবু হয়ত কথা বলছেন, রেডিও শুনছেন, তাই খেয়াল নেই কটা বাজল কিন্তু বেরালগুলোর ঠিক খেয়াল আছে। দশটা বাজলেই কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে পুসী আবার এসে ছোড়দির পায়ে গা ঘসতে থাকবে। যেন বলতে চায়, এবার সময় হয়েছে, চল।

স্নায়ুজগতের উচ্চতর মার্গের যে পরাবর্ত বা রিফ্লেক্স, তাই নিয়ে প্যাভলভ তাঁর সর্তাধীন পরাবর্ত বা কন্ডিশানড রিফ্লেক্সের সাড়া জাগানো কাজগুলি করেন। এই কাজগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি দেখান যে স্নায়ুজগতে, যখন আমরা মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, এ সবের কথা বলি, তখন সেগুলি বলতে গিয়ে বস্তুবাদ ছেড়ে ভাববাদী হয়ে উঠি। প্যাভলভ মনোবিদ্যাকে ভাববাদ থেকে মুক্তি দিলেন।

এইমাত্র যখন কুকুরের লজিকের কথা বলছিলাম, তখন কি আমরা বিজ্ঞানের বস্তুবাদ ছেড়ে ভাববাদী কথা বলছিলাম না ? আমার তা মনে হয় না। কেন তাই বলি।

শরীরের সর্বপ্রকার চলাচলেরই একটা পরম্পরা আছে। খাওয়ার কথাই

যদি ধরি, তা হলে মুখে খাবার নিয়ে চিবানো, তারপর গিলে ফেললে সেই দাঁত দিয়ে পেষণ করা খাদ্য পাকস্থলীতে পৌছচ্ছে। পাকস্থলীতে যতটা হজম হবার, হয়ে তারপর ক্ষুদ্র অন্ত্রে শেষটুকু হজম হয়ে, যা হজম হবার নয়, সেটুকু বার হয়ে যাবার জন্য বৃহৎ অন্ত্র ও শেষটায় পায়ুতে পৌঁছচ্ছে। প্রতিটি জায়গায় কতক্ষণ থাকবে তারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। এই সময়ই হল প্রাণীর শরীরের নিজস্ব ঘড়িরই সময়।

একটু আগে বলছিলাম না অতীত কি ভবিষ্যতের ধারণার কথা ? খাদ্যের কথা দিয়েই বলি। খাবার পরে খাদ্য যখন হজম হতে সুরু হয়েছে তখন তা অতীত। আবার যখন ক্ষিধে পেল, খাবার আসবে, কিন্তু তখনো আসে নি, সেসময়ে তা ভবিষ্যৎ। অবশ্য খাদ্য কি ? তার একটা ছাপ বা ইম্‌প্রিন্ট প্রাণীর স্নায়ুতে রয়েছে। একে কেন্দ্র করেই সেই প্রাণীর অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ। এর মধ্যে ভাববাদী কোন কিছু আছে কি ?

কথাটা যখন উঠলই তখন মানুষের স্মৃতি, অতীত, ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। মানুষ যদিও বিবিধপ্রকার বিমূর্ত বা এ্যাবষ্ট্র্যাক্ট ভাবনা চিন্তা করতে পারে, তা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান যাই হক; হয়েছে মানুষের "কথা" আছে বলে। কথা কি ? এটা একটা প্রতীক। যা দিয়ে একটা ইঙ্গিত করা যায়। একে তাই ইংরাজিতে বলা হয়েছে সিগন্যাল অফ সিগন্যালস। তার মানে কথার মধ্যে দিয়ে, একটা ইঙ্গিতের মাধ্যমে পর পর বহু ইঙ্গিত করতে পারি। এর সংখ্যা যত বেশী হবে, চিন্তাও তত বেশী বিমূর্ত বা এ্যাবষ্ট্র্যাক্ট হবে। যেমন অঙ্ক কষতে ধরা হল এক্স, × একটা অজানা সংখ্যা। কষে বার হল × = ৫। তা হলে দাঁড়াল, অজানা = × = ৫। তার মানে সিগন্যাল, মানে ইঙ্গিত বা প্রতীকই তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। এইভাবে চিন্তা যত বিমূর্ত হয়, সাধারণবুদ্ধি মানুষের কাছে তা তত দুরূহ হয়ে ওঠে, যেমন এই প্যারা-গ্রাফের বক্তব্যটাও হয়ত হয়ে থাকতে পারে। অথচ একটু তলিয়ে বুঝলে আর তা মনে হবে না।

বিবর্তন ব্যাপারটা চমৎকার। উদ্ভিদের একজায়গা থেকে আর এক-জায়গায় যাবার দরকার হয় না। তাই তার পেশী বা পেশীর বিকল্প কিছু নেই। লজ্জাবতী কি ফ্লাইট্রাপ জাতের গাছের পাতা যে নড়াচড়া করে, তা ছোঁয়া লাগার ফলে পাতার জলীয় বস্তুর কম বেশীর জন্যই হয়। একে পেশী বা স্নায়ুর আগের ধাপ মনে করাটা ভুল হবে।

প্রাণীদের মধ্যে যারা চলাচল করে, তাদেরও চলাচল করতে হয়, এক-জায়গায় খাবার জুটছে না বলেই। চলাচল করতে হয় বলেই এদের পেশী, আর পেশীর জন্য স্নায়ুরও উদ্ভব হয়েছে। সেই স্নায়ু মানুষের মধ্যে তার শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে বিকশিত করেছে।

বিবর্তনের কাঠামোয় সব কিছু ঠিক ভাবে বুঝলে, তবেই তো বোঝা যাবে জীবনের অদ্ভুত রহস্য।

৩৩

দলবদ্ধ প্রতিরোধ

তিরিশ চল্লিশটা চড়াইপাখী একটা ঘন, ঠাস বোনা দল বেঁধে, কিচির-মিচির কিচিরমিচির করে একটা বেরালের ফুটখানেক ফুটদুয়েক উপরে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, আর বেরালটা ছুটে পালাচ্ছে, এ দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। ব্যাপারটা কি ? চড়াইপাখীর ভয়ে বেরাল পালাচ্ছে ? ঠিক তাই। কিন্তু কেন ?

চড়াইপাখীর চেয়ে নিরীহ প্রাণী আর আছে কি না সন্দেহ। আর এই-রকম বলেই, বাড়ীর পোষা বেরালগুলো পর্যন্ত সুবিধা পেলেই চড়াই ধরে। অবশ্য চড়াই হাজার হলেও পাখী। আর বেরাল যত চটপটে আর যত বড় শিকারীই হক না কেন, চড়াই ধরাটা বেরালের কাছেও খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য বেরালকেও বেশ পরিশ্রম, কি বলা উচিৎ বোধ হয়, আয়োজন করতে হয়।

এই সময়ে বেরালটা হয়ত যেখানে চড়াই পাখীরা নেমে এসে লাফাতে লাফাতে খাবার সংগ্রহ করছে, তার একটু দূরে শুয়ে ঘুমতেই সুরু করল। বেরালটা ঘুমচ্ছে, তার কোন নড়ন চড়ন নেই, ফলে তাকে আর একটা জল-জ্যান্ত বেরাল বলে মনেই হয় না। তাতে হয়ত চড়াইপাখীগুলো বেরালটার আরো কাছে যাতায়াত করতে লাগল। তার পরে সুযোগ বুঝে বেরালটা হয়ত খপ করে ধরে ফেললে একটা চড়াইকে। একেবারে নগদ লাভ।

কাকেদের যে রকম সামাজিকতার বোধ, তা যদি চড়াইয়ের থাকত, তা হলে একটা চড়াই বেরালের হাতে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চড়াই-মহলে একটা তুলকালাম ব্যাপার সুরু হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক অতটা সামাজিক প্রাণী চড়াইরা নয়। তবে সেই একটা কথা আছে না, যে কোনঠাসা হলে বেরালও রুখে দাঁড়িয়ে বাঘের মত হয়ে ওঠে। এক এক সময়ে চড়াইরাও দেখেছি রুখে ওঠে।

ব্যাপারটা ঠিক ওইরকমই হয়েছিল। একটা বেরাল একটা চড়াইকে ধরেছিল। এই ব্যাপারটা দেখে প্রায় গোটা পঁচিশ চড়াই, একসঙ্গে কিচির-মিচির করতে করতে, বেরালটার ফুটখানেক কি ফুট দেড়েক উঁচুতে যেন বেরালটার মাথায় একটা চাঁদোয়ার মত তৈরি করে উড়তে সুরু করল। এ ব্যাপারে বেরালটাও বেশ ভয় পেল। ভয় পেয়ে বেরালটা ছুটতে সুরু করল। বেরালটাও যেদিকে ছুটে যাচ্ছে, ঠিক তার উপর দিয়ে চড়াইগুলোও কিচির মিচির করতে করতে উড়ে যেতে লাগল। বেরালটা শেষ পর্যন্ত জ্বালাতন হয়ে, এধার ওধার একটু এলোমেলো ছোটাছুটি করে, একটা ঘরে ঢুকে গেল। সেই ঘরে ঢুকে তবেই বেরালটা চড়াইয়ের হাত থেকে নিস্তার পেল।

বেরালটা ভয় পেল সত্যিই। কিন্তু চড়াইদের এই প্রতিক্রিয়ার মানেটা কি ? প্রতিহিংসা ? ধমক ? ভয় ? না কি টিনবারজেন একে যা বলেছেন "কলিং এলার্ম" বা বিপদসংকেত জানানো। কাকের মত যূথবন্ধ ও দলের মধ্যে অসামান্য একতা না থাকলেও, চড়াইরা দল বেঁধে খাদ্য সংগ্রহ করে; দল বেঁধে জলে বা ধুলায় স্নান করে। এজন্য গলার শব্দ খুব জোরালো না হলেও, এরা খুবই মুখর। এদের মুখ কাজ করছে না, এটা কমই দেখা যায়। হয় তা ব্যস্ত খাওয়াতে, নয় কিচির মিচির করাতে।

দল বেঁধে ঘোরাফেরা করে, এমন বহু প্রাণীই, পরস্পরকে ইসারায় হক, বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে দেয়। এমনকি পায়রারা, যারা প্রায় শব্দ করতেই পারে না, যখন দলবেঁধে উড়ছে, তখন একটা বাজপাখী দেখা গেলে একজন ইসারায় সবাইকে সজাগ করে দেয়।

হায়না ও নেকড়েরাও দলবেঁধে শিকার করে। এ জন্য তারা তাদের চেয়ে অনেক বড় বড় জন্তুদেরও ঘায়েল করতে পারে। তাই সে সব প্রাণীও নিজেদের মধ্যে দল বেঁধে আত্মরক্ষা করে। বাইসন জাতের কোন কোন প্রাণী, যেমন মাস্ক অক্সরা নেকড়ের হাত থেকে সদলবলে বাঁচবার জন্য, পুরুষরা স্ত্রী ও শিশু প্রাণীদের ঘিরে গোল হয়ে সিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যূহ রচনা করে দল বেঁধে এলেও এ ব্যূহকে নেকড়েরাও খুব ভয় পায়। কেন না এ সময়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে, বেশ অনেক নেকড়েই হয় মরবে, নয় জখম হবে। তাই সেরকম বড় ব্যূহ দেখলে নেকড়ের দলও পালায়। এই প্রাণীর বিপদসংকেত জানাবার পদ্ধতি এই। নেকড়ের গন্ধ পেলে কি ডাক শুনলে এরা এইরকম সংগঠিত হয়ে যায়।

প্রাণীরা ভয় পায় দু রকমের ব্যাপারে। এক হল, যুগ যুগ ধরে যে সব প্রাণীর আক্রমণ তাদের উপর হয়েছে, সেই প্রাণী বা বস্তু দেখে। আর তা

না হলে, যা দেখতে মোটেই অভ্যস্ত নয়, এ রকম কিছু দেখে। আমারই নিজের দেখা একটা ঘটনার কথা বলি।

আমার ছোড়দির বাড়ীতে একটা বেশ বড় কুকুর ছিল। বাড়ী পাহারা দেবার জন্যই এটাকে ওরা পুষেছিল। কুকুরটার সাহসও খুব। বাড়ীতে কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে আর রক্ষে নেই। এমনকি গরু, মোষ পর্যন্ত এই কুকুরের ভয়ে ফটকের ভিতর ঢুকতে সাহস করত না। গরু, ছাগল, মোষ ধারে কাছে এলেই ও যেত তেড়ে ঘাউ-ঘাউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে। এ হেন কুকুরটার সেদিন একটা ছোট খাট ছাগলীকে দেখে, ভয় পেতে দেখে আমরা আশ্চর্য হলাম। একেবারে চুপ; দুপায়ের ভিতর ল্যাজ ঢুকিয়ে পালিয়ে গেল। অথচ ও তো ছিল ছাগলের যম। ব্যাপারটা কি, তা একটু ভাল করে লক্ষ্য করতে তবে বোঝা গেল। কুকুরটা যে ছাগলগুলোকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের কারুর দাড়ি ছিল না। অথচ এই ছাগলীটার দাড়ি আছে। এই ব্যতিক্রমটুকুর জন্যই ও ভয় পাচ্ছিল। ছাগলের দাড়ি দেখতে সে অভ্যস্ত নয় কাজেই ওইতে সে ভয় পেল। এ যেন অনেকটা মুখে একটা মুখোস কেউ পরলে শিশুরা যেমন ভয় পায়, সেইরকম আর কি।

যে কোন রকমের ভয়ের অবস্থা বা পরিস্থিতি থেকে প্রাণীদের বাঁচার উপায় হল, দল বাঁধা। এই মাত্র দেখলাম, চড়াই পাখীর মত প্রাণীরা কি করে দল বেঁধে, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে হলেও বেরালকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে। তার দ্বারা বেরালের পক্ষে ধাত বুঝে চড়াইয়ের উপর আক্রমণ যে বন্ধ হয়ে যাবে, তা মোটেই নয়। কিন্তু তবু এটুকু না থাকলে, বোধ হয় চড়াই জাতের ছোট ছোট প্রাণী টিঁকে থাকতে পারত না। ছোট প্রাণীর বাঁচার উপায় একদিকে সংখ্যাধিক্য; আর অন্য দিকে দল বেঁধে শত্রুকে আক্রমণ, কি শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ।

৩৪

"অব মাইস এণ্ড মেন"

আচরণতত্ত্বের আলোচনা করতে গেলে শারীরবৃত্তিক দিকটাও তার বুঝতে হয়। ১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ হেস, ব্রুগার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা বেরালের উপর অনেক পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন উচ্চ মস্তিষ্কের নিচে, মস্তিষ্কের যে অংশকে হাইপোথ্যালেমাস বলে, তার মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ অংশ আছে, যেগুলিকে বিদ্যুতের দ্বারা উত্তেজিত করলে বেরালটা খাবার চায়, নয়ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা না হলে আক্রমণ করে, ইত্যাদি। এ থেকে মনে হয় প্রাণীর বিশেষ আচরণের মূলে মস্তিষ্ক বা উপমস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ জায়গার উত্তেজনা।

এটা ভাবলে মনে হবে, তা হলে তো ব্যাপারটা বোঝাই গেল, আর কোন জটিলতা নেই। এটাকে রিডাকশানিজম, বা অতি-লঘুকরণ বলা যায়। এ কথা বলতে গিয়ে আমাদের বন্ধু এক স্বর্গতঃ মনোবিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ছে। তিনি খুব খুসী হয়ে বলেছিলেন যে হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যেই, রাগ, অনুরাগ, বিদ্বেষ কি আমাদের যে কোন আচরণের পিছনে, কি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটছে তা জানা যাবে।

উপরে যা কথা বলা হল, তা থেকে যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের বাহাদুরী অবশ্যই বলা যায়, কিন্তু সেটা মনোবিজ্ঞান বা আচরণতত্ত্বের বাহাদুরী মোটেই নয়। অবশ্য মনোবিজ্ঞানের সংগেও পদার্থবিদ্যা কি রসায়নের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হক, এটা অবশ্যই চাই; কিন্তু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, আজ অনেক উঁচুতে উঠেছে বলেই, অন্য বিজ্ঞানের কিছু করতে গেলেই ওদের মুখ চেয়ে থাকা ঠিক নয়। এ যেন হল দরিদ্র আত্মীয়ের- নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, এক-আধজন ধনী আত্মীয়ের সাহায্যের উপরই শুধু নির্ভর করার মতন।

ওয়াটসন আর ক্রিক দেখালেন যে ডি-এন-এ বা ডেসক্সি রাইবো নিউক্লিইক এ্যাসিডের ভিতর গুয়ানিন, থাইমিন, এ্যাডিনিন, সাইটোসিন,

এগুলিই এক একটি অক্ষরের মতন এক একটি সঙ্কেত। অর্থাৎ এক একটি করে অক্ষর সাজিয়ে যেমন যে কোন কথা লেখা যায়, তেমনি বুঝি বলা যাবে, যে রাসায়নিক অক্ষরের কাঠামো দিয়েই তৈরি দেহ, প্রাণ ইত্যাদি সব। কিন্তু এ কথা মনে করলেই আমরা আবার সেই অতি লঘুকরণ করে বসলাম।

আমেরিকার সায়ান্স পত্রে মাইকেল পোলানি এ'সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন যে জীবনকে লঘুকরণ করে রসায়ন আর পদার্থ-বিদ্যায় সবই বোঝা যাচ্ছে এটা সত্যি নয়। কেন না যে কাগজে এই লেখা গুলো রয়েছে, সে কাগজটার বিশেষ রাসায়নিক গড়ন অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা বুঝলেই যেমন এই কাগজটায় যা লেখা আছে, তা বোঝা হয়ে গেল না, তেমনিই প্রাণ ও দেহ গঠনের কিছু রসায়ন বুঝলেই প্রাণ কি জীবনকে বোঝা গেল, এ নয়।

তিনি আরো বলছেন যে ডি-এন-এ মাধ্যমে প্রোটিনবিশেষ তৈরির যে ইসারা, তা থেকেই বরং আরো বোঝা যায় যে যন্ত্রের যেমন একটি ঘাট, একটি মুখ ঠিক সেই জায়গাতেই বসবে, অন্য কোথাও নয়। এ কাঠামো ডি-এন-এর মেনে চলে না। সেখানে কোন কোন জায়গায় একই ইসারায় একাধিক প্রোটিন তৈরি হতে পারে। এই স্বাধীনতাটাই জীবনের বিশেষত্ব। এর অতি লঘুকরণটা ভুল। পোলানির লেখার বৈজ্ঞানিক জটিলতার মধ্যে না গিয়েও, তাঁর মূল বক্তব্য যে কত মূল্যবান তা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে পোলানি "বাউণ্ডারি কণ্ডিশান", বা সীমানার অবস্থার কথা তুলেছেন। কথাটা একটু আলোচনা করা দরকার। ধরা যাক হাঁড়িতে মাংস রান্না হচ্ছে। মাংসর ব্যাপারে হাঁড়িটাই সীমানা। কিন্তু সেখানে আমরা হাঁড়ির কথা ভাবছি না; ভাবছি মাংসর কথা, যেটা এই সীমানার ভিতরে। আবার যখন দাবা খেলা হচ্ছে, তখন সীমানা হল ঘুঁটি, ছক এইগুলি। কিন্তু সেখানে নজর আমাদের এই সীমানার বাইরে, খেলার ফলাফলে। ঠিক এমনি ভাবেই সীমানার অবস্থার বদল হয় যখন আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন কি আচরণতত্ত্ব নিয়ে কথা বলি। অবশ্য মাংস রাঁধতে গেলে যেমন হাঁড়িটা ফাটানো চলবে না, দাবা খেলতে হলে ছক, ঘুঁটি সব ঠিক রাখতে হবে, তেমনি রসায়ন, পদার্থবিদ্যার যা' দেয়, তা' বজায় রেখেই অন্য বিজ্ঞান। কাজে কাজেই কোন একটি বিজ্ঞান, অন্য একটি বিজ্ঞান দিয়ে অতি লঘুকরণ করা সম্ভব নয়। তা' করলে বলতে হবে যে এ যেন হাঁড়িটা চেটে ভাবলাম খুব মাংস খাওয়া হল। কি ঘুঁটিগুলো নাড়াচাড়া-টাকেই তো দাবা খেলা বলে ভাবা।

এত কথা বললাম, অন্য একটি প্রসঙ্গ তোলার জন্য। প্যাভলভ যখন তাঁর সর্তাধীন পরাবর্তের পরীক্ষায় ঘণ্টা বাজানো, খাবার দেয়া, ও কুকুরের নাল পড়া নিয়ে পরীক্ষা করলেন, তখন অনেকে ভাবলেন, প্যাভলভ-সুইচ টিপে দিলাম, আর আলো জ্বলে উঠল,—এমনি একটা পর্যায়ে বুঝি আচরণতত্ত্বকে নিয়ে এলেন। সেই কথা ভেবে আমেরিকার স্কিনার ও তাঁর শিষ্যরা ভাবলেন, যে ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, মানুষের ভাবনা, চিন্তা, আচরণ, সব নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এইটাই সেই অতিলঘুকরণ। জীবনকে এই পর্যায়ের ভাবাটা ভুল হবে।

এখনো পর্যন্ত আলোচনাটা বড় তাত্ত্বিক হয়ে গেল। তাই একটু ইঁদুরের কথা বলি। সেই বিখ্যাত আমেরিকান লেখক উইলিয়াম সরোয়ানের সেই বইটি আছে না, "অব মাইস এ্যান্ড মেন।" আমার গল্প ল্যাবরেটারির ইঁদুরদের নিয়ে। এদের বলে "পিওর ষ্ট্রেন।" অন্ততঃ কুড়ি প্রজন্ম ধরে ভাই-বোন ইঁদুরে সন্তান উৎপাদন করেই এ ষ্ট্রেন তৈরি। এর যে কোন একটি প্রাণী দেখতে, আচার-ব্যবহারে, শারীর বৃত্তিতে আর একটির যমজের মত। রোগ ও রোগ-প্রতিরোধ সবই হুবহু এক। এমনকি ব্যবহার পর্যন্ত। তবু, সেই তবুর কথাই বলি।

যে জাতের ইঁদুর ব্যবহার করা হচ্ছিল, তার নাম সি—৫৭—কালো। একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য একটা খাঁচায় দুটোকে রাখা হয়েছিল। খাঁচাটার মাঝখানে খাঁচাটা যে রকম, তেমনি একটা জালের পার্টিশান। এদিকে আর ও দিকে দু'দিকেই খাবার, জল সব আছে। একেবারে দুটো ঘরই স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

শারীরবৃত্তিক দিক থেকে দুই ঘরের দুটি ইঁদুর একেবারে এক। যেমন সমান পরিমাণে একই ওষুধ বা ইঞ্জেকশানে ঠিক একই ফল দুটো ইঁদুরেরই হবে। ক্যানসার হবে কি না হবে, তাও প্রজাতি অনুযায়ী দুটিরই এক। অর্থাৎ বলতে চাইছি শরীরে, আচারে, আচরণে এরা একই। তবু ছোট ছোট আচরণে তফাৎ ছিল বৈ কি। যেমন ইঁদুর দুটোর মধ্যে একটা ক্রমাগত মাঝের পার্টিশানের জালটায় উঠতে সুরু করল, আর একটা তার ধারে কাছেও এলো না। এই যে ব্যষ্টি হিসাবে দুটি প্রাণীর বিশিষ্টতা যে বিশিষ্টতায় একজন আর একজন থেকে স্বতন্ত্র; এই খানেই জীবনের বৈশিষ্ট্য। এর আর কোন তুলনা নেই। আর এ বৈশিষ্ট্য কখনো একটি চিনির দানা ও অন্য একটি চিনির দানার মধ্যে দেখা যাবে না।

৩৫

আচরণতত্ত্ব

জীবের যেমন বিবর্তন আছে, ঠিক অনুরূপ বিবর্তন ঘটেছে তাদের আচরণের। প্রাণী কথাটা ব্যবহার না করে ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম জীব কথাটা, যাতে উদ্ভিদ-জগৎকেও এই আলোচনার মধ্যে টানা যায়। উদ্ভিদদের এই কারণে টানতে চাচ্ছি, কারণ তারা নড়া চড়া করে না বা করার দরকার হয় না। খাদ্য তারা নেয় মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে। শ্বাস, প্রশ্বাস চলে পাতার মধ্যে দিয়ে। এই পাতায় সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ধরে নিয়ে তাকে খাদ্যে পরিণত করছে।

তা ছাড়া পাতা, গুঁড়ি, শিকড়, এই রকম পরস্পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে সাংগঠনিক পার্থক্যটা অল্প হওয়ার জন্য, আর তা' ছাড়া সেগুলিও একই জায়গায় বাঁধা থাকে বলে আচরণটা প্রত্যক্ষ হয় না। তবু গাছপালারও একটা আচরণ আছে।

ধরা যাক একটি গাছকে রাখা হল ঘরের ভিতর। সে ঘরে শুধু একদিকে একটি জানালা দিয়ে আসে আলো। দেখা যাবে গাছটার ডালপালাগুলো ক্রমে ক্রমে আলোর দিকে বেঁকে যেতে থাকবে। এটাকে অবশ্যই গাছের আচরণ বলে বলতে হবে। তবে এ আচরণের প্রকাশ ঘটতে দিনের পর দিন লেগে যায়।

আচরণতত্ত্বের একদিকে উদ্ভিদের মন্থরতা, আর একদিকে যদি মানুষের আচরণের কথা ধরি, তা হলে তার সভ্যতা, তার সাহিত্য, শিল্প বিজ্ঞান, রাজনীতি, হিংসা, যুদ্ধ, ঘোরপ্যাঁচ, ইত্যাদি সব এসে যায়। কাজেই দেখা যায় যে শুধু মানুষের আচরণই আজ কত জটিল হয়ে উঠেছে। এর বিবর্তনের ইতিহাসই প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস।

আচরণতত্ত্বের বিবর্তনের ধারাটার অনেকখানিই আমাদের জানা নেই।

যেটুকু জানি, তাই সংক্ষেপে আলোচনা করছি। প্রথমেই ধরা যাক উদ্ভিদের কথা। সূর্যের আলো তার প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও, আলোর দিকে ঝুঁকে পড়তে এত সময় লাগল, তার কারণ হল, একটি উত্তেজনাকে তড়িঘড়ি নেয়া, ও নেয়ার পরে তড়িঘড়ি যথোপযুক্ত কিছু করার মত যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় তৈরি হয় নি। এই যন্ত্রের প্রথম সুরু দেখা গেল স্বাধীন বিচরণকারী এককোষী প্রাণী, যেমন এ্যামিবা কি প্যারামেসিয়ামের মধ্যে।

তবে শুধু একটি কোষই এদের দেহের সর্বস্ব বলে, উত্তেজনায় সাড়া ও তারপর তার কাছে আসতে হবে, না তা থেকে পালাতে হবে, এ দুয়ের যাই করতে হক, ওই একটিমাত্র কোষ দিয়েই করতে হয়। তাই যে কোন রকম ক্ষতিকর কিছুর কাছাকাছি হলেই কোষটি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আবার খাদ্যের মত কল্যাণকর কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ হলে কোষটি সেটা নিতে চায়।

প্রাণী বিবর্তনে যখন বহুকোষীও শেষ পর্যন্ত উদ্ভব হল। এর মধ্যে একটি হল, উত্তেজনা গ্রহণ করার জন্য একটি গ্রাহক যন্ত্র। তারপর সেটি পাঠানোর উপযুক্ত পরিবাহক। আর একটি কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে এই উত্তেজনার উপলব্ধি হতে পারে। এটা তো হল একদিকের পথ। যে পথে উত্তেজকটা কি তা বোঝা গেল। ঠিক ওমনিই কিছু করার জন্য উল্টো দিকে থাকে কেন্দ্র; কেন্দ্র থেকে পরিবহন পথ; কাজ করবার যন্ত্র। শারীরবৃত্তের ভাষায় একেই বলা হয়েছে রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত।

বলা যায়, বিবর্তনের এই ধাপ থেকেই সুরু হল, স্নায়ু ও পেশীর যুগ্ম বিবর্তন। ভ্রূণ অবস্থা থেকে পরে স্নায়ু হবে কি পেশী হবে, এমনি বিবিধ টিসু বা কলা, চোখ-কান-নাক-জিভ চামড়ার মতন এক একটি বিশেষ ও জটিল যন্ত্রও আবার তৈরি করেছে। তেমনি আবার হাত, পা, খাদ্যনালী ইত্যাদির মতন যন্ত্রও তৈরি হয়েছে।

যে যন্ত্রকে যে রকম কাজ করতে হয়, তেমনি তার জটিলতা। কিন্তু জটিলতা ছাড়াও বিবর্তনে আর একটি জিনিসের উদ্ভব হল, প্রয়োজনের খাতিরে, তা হোল যেটা ঘটল তার ছাপ, স্মৃতি, ছবি বা অন্য যাই বলি না কেন। ছাপ, ছবি, আর স্মৃতি, যে কথাগুলি ব্যবহার করলাম, এর সব কটিই প্রকৃতি ব্যবহার করেছে সংবেদন আর সাড়ার বিবর্তনে। আর এ করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ বিশেষ সংবেদনটির ছাপ বা ছবি না পেলে, সাড়াটা দেয়া হবে কি করে ? তাই ছাপ, ছবি আর স্মৃতির জন্য বিবর্তনে প্রাণীদেহে জন্ম নিল বিচিত্র স্নায়ুমণ্ডলী আর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি।

যে কোন উত্তেজক বা সংবেদনা স্নায়ুতে তার ছাপ ফেলে। কখনো এই ছাপ স্থায়ী। এর বিশেষ নামও আচরণতত্ত্বের পিতৃস্থানীয় কনরাড লরেন্স দিয়েছেন-ইম্প্রিন্ট বা ছাপ বলেই। আর ছবি ? ক্যামেরার পর্দায় ঠিক যে রকম ছবিটি ফিল্মের উপরে পড়ে, যা কিছুই চোখ দেখছে, তাই চোখের কাছে এই রকম ছবি। আর স্মৃতি হল যাতে যে কোন ছবি, যে কোন ছাপ ধরা থাকে। যে প্রাণী বিবর্তনে যতটা এগিয়ে, তার স্মৃতিও তত বেশী। শেষ পর্যন্ত মানুষ, শিলালিপি থেকে সুরু করে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছু দিয়ে স্মৃতি ধরে রেখেছে। সেই ধরে রাখা স্মৃতি হাজার হাজার বছরের। এক কথায় মানুষ কোন কিছুরই স্মৃতি নষ্ট হতে দিতে চায় না।

স্মৃতি ধরে রাখার জন্য মানুষ বহু উপায় অবলম্বন করেছে। ছবি, পাথরে খোদাই ভাস্কর্য, মাটি, কাঠ পাথরের মূর্তি, লিপি, লেখা, ছাপা, এমনকি ইলেকট্রনিক ব্রেন যন্ত্রে ধরে রাখা বিদ্যুত-তরঙ্গ পর্যন্ত। সেই জায়গায় একবার তুলনা করে দেখা যাক প্রকৃতি স্নায়ুতে কি ভাবে স্মৃতিকে ধরে রাখে। প্রকৃতির অক্ষর হল রাসায়নিক। নিউক্লিইক এ্যাসিডে এ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন, সাইটোসিনের মধ্যে দুটি করে নিয়ে, তারই একটা পরম্পরাই স্মৃতি। এতে প্রকৃতির কিন্তু একটা সুবিধা। খুব অল্প জায়গায় অনেক জিনিস রাখা যাচ্ছে। একটা বড় অণুর মধ্যে ধরা রইল অনেকটা জিনিস। সেই জায়গায় আমাদের একটা অক্ষরও কত বড়।

একটা জিনিস আশ্চর্য মনে হয়। মানুষ স্মৃতি ধরে রাখার জন্য যত রকমের উপায় নিয়েছে, সেই জায়গায় প্রকৃতি বিশেষ রসায়নেরই উপর নির্ভর করে রয়েছে কেন ? অথচ সেই জায়গায় যদি বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা ভাবা যায়, তা হলে দেখি একই উত্তেজককে বোঝবার যে ইন্দ্রিয়, তা বিভিন্ন প্রাণীতে কত বিচিত্র। যেমন স্পন্দন আমাদের কাছে যখন শব্দ, তা আমরা নিই কানে। কিন্তু মাছ স্পন্দন বোঝে তাদের ল্যাটারাল লাইন অরগ্যানে। আবার ফড়িং জাতের প্রাণীরা স্পন্দন গ্রহণ করে তাদের ডানায়। বহুপ্রাণীই স্বাদ নেয় জিভে। কিন্তু মৌমাছি, প্রজাপতি স্বাদ বোঝে তাদের পা দিয়ে। এ রকমের উদাহরণ দেয়া যায় তো কত। কিন্তু উদাহরণ না বাড়িয়েও একটা জিনিস বোঝা যায়, যে এ ব্যাপারে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অভাব নেই কিন্তু স্মৃতির ব্যাপারে কেন তা নয় ?

মনে হয় এর কারণ ওই একটি। একটি অণুতে কয়েকটি পদার্থের পরমাণুর পরম্পরায় যদি স্মৃতি ধরে রাখা যায়, তা হলে জায়গাটা খুবই

কম লাগে। যেমন মানুষের খুলির ব্যাস গড়ে কুড়ি ইঞ্চি হবে। এর মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক। তাতে কত জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি। যদি ওইরকম একটা কম্পুটার করা যেত, তা সারা কলকাতার সমান জায়গা জুড়ে থাকত। তাই বোধ হয় প্রকৃতি রাসায়নিক পদ্ধতিতে তার রেকর্ড রাখে।

ছাপটাকে ধরে রাখার ব্যবস্থা যদিও একরকম, তবু গ্রাহকযন্ত্র এত ভিন্ন বলে বোধ হয় প্রাণীজগতের আচরণে এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্য। এর সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য মানুষের ভাল লেগেছে চিরদিন, কিন্তু প্রাচীন মানুষের এ বোঝার ক্ষমতা ছিল না। মাত্র কিছুদিন হল প্রাণীবিদ্যার একটা নতুন শাখা হিসাবে ইথোলজি বা আচরণতত্ত্বের চর্চা সুরু হয়েছে। আর এ তত্ত্বের চর্চাকে প্রথম বিশ্বস্বীকৃতি দেয়া হল যখন হানস ফ্রিৎস, কনরাড লরেন্স, নিকোলাস টিনবারজেনকে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হল।

নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে মেলে প্রচুর খ্যাতি। সেই খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তখন জানতে চায়, কি এদের কাজ। দেখা গেল কনরাড লরেন্স কি নিকোলাস টিনবারজেনের যে বইগুলি লেখা হয়েছিল জনসাধারণের জন্য, তা' লোকে পড়তে লাগল। অথচ এঁরা নোবেল পুরস্কার পাবার আগে এই বইগুলিতেই ধুলো জমছিল; কেউই পড়ছিল না, দেখেছি।

ধুলো ঝেড়ে আচরণতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কিছু জ্ঞান হয়েছে বটে। কিন্তু প্রাণীর আচরণের বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান আজ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও কম। অথচ এটা জানা খুবই দরকার। একদল বা একজন মানুষের আচরণে অন্যকে বা অন্যদের কষ্ট পেতে হয়। আচরণতত্ত্ব ও তার বিবর্তন সম্পর্কে জানলে তবেই তো বোঝা যাবে অপরের পক্ষে যা কষ্টকর সে আচরণ আমরা করি কেন ও এ থেকে মুক্তির উপায় কি।

এ তো গেল একটা দিকের কথা। এ ছাড়া আর একটা দিকও আছে। সেটা হল প্রাণীদের আচরণে সামাজিকতা। মানুষ অবশ্যই সামাজিক প্রাণী। তবু তার সামাজিকতার মধ্যে এক-একটা করে অনেক দেয়াল। আচরণের বিবর্তনের কথা যদি ধরি, তা হলে মনে হয়, বিবর্তনের গতি হল এই দেয়ালগুলো উঠিয়ে দেবার দিকে। এটা সত্যি কি মিথ্যে তা আমাদের জানতে হবে আচরণ চর্চার মাধ্যমেই।

৩৬

লিপ রিডীং

প্রসঙ্গক্রমে আগে বলা হয়েছে যে কুকুরের নাক ও কান কত তীক্ষ্ম। সামান্যতম গন্ধ, সামান্যতম শব্দ সম্পর্কেও ওদের ইন্দ্রিয় অসামান্য সজাগ। আমাদের কানে যে শব্দ পৌঁছয় না, কুকুর তা টের পায়। যদি ভাল করে বুঝতে না পারে, মনঃসংযোগ করে, ঘাড় ঘুরিয়ে, এদিক ওদিক কান নেড়ে, বোঝার চেষ্টা করে। তারপর বোঝা হয়ে গেলে, তখন কিসের শব্দ, সেই অনুযায়ী ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ, বা ঘাউ ঘাউ শব্দ করে বিরাগ জানায়।

আমাদের বাড়ীর পোষা কুকুর সিলটুও এর ব্যতিক্রম নয়। যখন আমরা কেউ শুনতেও পাইনি, অতি দূর থেকেও, আমাদের গাড়ীর হর্ন ওর কানে পৌঁছবে, ও হাজির হবে দরজায় সবার আগে। ঘাউ ঘাউ করে চেঁচিয়ে ইসারা করবে দরজা খুলে দেবার জন্য।

আজকালকার দিনে সকলেই প্রায় বাড়ীতে রবারের চটি পরে। তাই চলাচল প্রায় নিঃশব্দ। এ রকম নিঃশব্দ চলাচলেও, হয়ত সিলটু তখন চোখ বুজে ঘুমচ্ছে; সেই অবস্থাতেও কান খাড়া করে চেয়ে বুঝতে পারল কে আসছে। অবশ্য এই কে আসা বুঝতে প্যারাটা গন্ধ, শব্দ সব মিলিয়ে। অবশ্য তার মধ্যে পুরো বুদ্ধিটা খাটানো তো আছেই।

কে আসছে, সেটাও যে ও বুঝতে পারে, এটা বোঝা যায়, ওর ল্যাজ নাড়া কি ডাকের বিভিন্নতার মধ্যে দিয়ে। যাই হক এখানে সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি না।

আমার মনে অনেকদিনের প্রশ্ন, কুকুর কি ঠোঁট নাড়া দেখে কথা বোঝা, যাকে আমরা চলতি কথায় লিপ-রিডিং বলি, তা করতে পারে ? লিপ রিডিংয়ের একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেললে কুকুরের অনুভূতিই বা কি হয় ?

সিলটু বেশ কিছু কথাবার্তা বুঝতে পারত। যেমন "সিলটু" শব্দটা

যে ওরই নাম, এটা ও জানে, "এসো" বললে আসে। "বসো" বললে বসে। মনোবিজ্ঞানী রেনওয়েল যেমন দেখিয়েছেন ঃ শ্রুতি অনুভূতিসংশ্লেষ প্রত্যয়। প্রত্যয় বলতে বোঝানো হচ্ছে Concept. আট ন মাসের একজন শিশুর চেতনা বিকাশের সঙ্গে হয়ত এর কিছু তুলনা করা যেতে পারে। কথাগুলো শোনা ও বোঝার এ স্তরটা তুলনীয়।

যাই হোক করা-পরীক্ষাটার কথা বলি। সিলটু শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। আমি ওকে ডাকলাম, যেমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ডাকি, "সিলটু !"

সঙ্গে সঙ্গে ও আমার মুখের দিকে চাইল ও কান খাড়া করে রইল, আমি কি বলি শোনাবার জন্য।

এইবার আমি ওর দিকে তাকিয়ে, যেন ওকেই, যে কথাগুলো ও বোঝে, সেই কথাই উচ্চারণ না করে শুধু ঠোঁট নেড়ে যেতে লাগলাম ওই কথাগুলো বলার ভঙ্গীতে।

এর ফলে দেখলাম ওর চোখ মুখের একটা গুরুতর পরিবর্তন হল। ওর চোখের শান্ত ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে, প্রথমে একটা গভীর মনোসংযোগের ভাব দেখা গেল সেই যাকে বলে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাই আর কি ! আর সেই সঙ্গে কান এদিক, ওদিক চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেন কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কথাগুলো তো আর আমি উচ্চারণ করছি না; তাই ও আর কোথা থেকে শুনতে পাবে ? শুনতে না পেয়ে ও আরো যেন বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল ও বিরক্ত হয়ে ঘাউ ঘাউ করতে লাগল।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। মানুষ হলে, অতটা দূর থেকে যখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সে হয়ত, একটু কাছে এসে শোনার চেষ্টা করত, শুনতে পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সিলটু কাছে এসে শোনার চেষ্টা একেবারেই করল না। কে জানে হয়ত ওর জানা, যে ওর শ্রবণ ক্ষমতায়, উচ্চারিত কথা অতটা দূর থেকে শোনা যাওয়া উচিত। তাই ও আর একটুও এগিয়ে শোনার চেষ্টা করল না।

একাধিকবার এ পরীক্ষায়, ঠিক ওই একই ফল পেয়েছি। আর দেখেছি, যে ঘড়ি ধরে কান খাড়া করা থেকে বিরক্ত হয়ে ঘাউ ঘাউ করা পর্যন্ত সময় লাগে, এক থেকে দেড় মিনিট।

পরীক্ষার আর একটি দিক আছে।

আরো একটি কৌতূহল আমার হল। সেই জন্য ঠিক অনুরূপ পরীক্ষা আরো কয়েকটি করেছিলাম, বিভিন্ন দিনে। প্রথমদিকের পরীক্ষায়, ঠোঁট নাড়াটা করছিলাম, কথার সঙ্গে মানিয়ে। অর্থাৎ যদি কেউ লিপ-রিডিং জানে, সে আমার ঠোঁটনাড়া দেখে, পুরোপুরিই বুঝতে পারবে, আমি কি বলছি।

পরের পরীক্ষাগুলোতে ঠোঁট নাড়াটা করলাম এলেমেলো। উদ্দেশ্য হল দেখা, সিলটু কি লিপ-রিডিংয়ের চেষ্টা করছে ? এলোমেলো ঠোঁট নাড়াতে ও কি আরো আগে বা তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে উঠবে ?

কিন্তু দেখা গেল যে তা নয়। এ পরীক্ষাতেও সময় লাগল একই। একমিনিট থেকে দেড় মিনিট দু'রকমের পরীক্ষাতেই সিলটুর আচরণ রইল হুবহু এক। তা' থেকে আমার মনে হয়, লিপ-রিডিংয়ের মত মানবিক ব্যাপারে, অন্যপ্রাণীর উৎসাহ নেই। কারণ ভাষার ব্যাপারটাই তো মানবিক। অন্য প্রাণীর জগৎটা শব্দের। মানুষের যেমন ভাষার, কথার। তার মধ্যে কয়েকটি কথার শব্দ ওদের কাছে খাদ্য বা অনুরূপ কিছুতে মূল্যবান হয়ে ওঠে। কয়েকটি কথাকে তাই মাত্র কয়েকটি বস্তুর সঙ্গে মাত্র একাত্ম করে ওরা দেখতে পারে। একে মানবশিশুর আটমাস থেকে একবছর বয়সের ভাষা-পূর্ব ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বক্তব্য

ছত্রিশটি অধ্যায়ে পশুপাখীর আচার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাটি করলাম। প্রতিটি প্রসঙ্গকে ছোট রাখার চেষ্টা করেছি একটি কারণে, যাতে এর আকর্ষণটা বজায় থাকে। জানি না, তা থেকেছে কি না। যদি না থেকে থাকে; সে দোষ আমার। কারণ তা হলে তা থেকে বোঝা যাবে যে আমিই আলোচনাটাকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করতে পারি নি।

গল্পের দিকটি ছাড়া, এই আলোচনায় বিজ্ঞানেরও কয়েকটি দিক আছে। এর একটি হল বিবর্তন। ডারইনইন, হাক্সলি, ওয়ালেশ পর্যন্ত বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে প্রাণীদের আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তবু পরিষ্কার ভাবে, মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা ছিল না যে প্রাণীর বিবর্তনের অর্থ তার আচরণেরই বিবর্তন। তারপর জীববিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করলেন ফ্রিৎস, তাঁর মৌমাছিদের সঙ্কেত আদানপ্রদানের তত্ত্ব প্রকাশ করে। তারপর বিভিন্ন প্রাণীর আচরণের উপর সাড়া জাগানো কাজ করলেন কনরাড লরেন্স ও নিকোলাস টিনবারজেন।

এই তিন জীববিজ্ঞানী, আচরণের বৈচিত্র্য শুধু দেখলাম, আর সেই গল্প আরব্য উপন্যাসের ঢংয়ে বলে গেলাম, এই পর্যায়ে না রেখে, একে গণিতের পরিমাণগত হিসাবনিকাশ, মাপজোকে নিয়ে এলেন। এর ফলে আচরণতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা কি রসায়নের মত একটি যথাযথ বিজ্ঞানের পরিমাণ-গত রূপ নিতে বসেছে। এর ফলে আজ ইউরোপ আমেরিকায় হাজার হাজার লোক আচরণতত্ত্বের কাজে ব্রতী। সে দিক থেকে আমাদের দেশে কাজ সুরু করাই হয় নি।

এই বইখানি সেই কাজ সুরুর ঘণ্টা মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

আট টাকা